উত্তরকাল

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

করকমলেষু—

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

প্রবোধকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প
মহাপ্রস্থানের পথে
ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে
জলকল্লোল
মল্লিকা
আলো আর আগুন
লাল রং
বন্যাসঙ্গিনী
আগ্নেয়গিরি
চেনা ও জানা
অঙ্গরাগ
পঞ্চতীর্থ
নদ ও নদী
দেবীর দেশের মেয়ে
অরণ্যপথ
দেশদেশান্তর
স্বাগতম
এই বুক
মধুচাঁদের মাস
পায়ে হাঁটা পথ
ভ্রমণ ও কাহিনী
মনে মনে
আঁকাবাঁকা
শ্যামলীর স্বপ্ন
বন্দী বিহঙ্গ
নীচের তলায়
কল্লান্ত
কাদামাটির দুর্গ
ইত্যাদি

আর কোনো কথা মনে এলেও বলবো না। আমার প্রণাম গ্রহণ করো।—ইতি—তোমার বেদেনী!

পরের চিঠিখানাতেও ওই একই বিদ্রূপ,—শুনতে পাই, তুমি নাকি আজকাল তোমাদের ওই জনগণের সঙ্গে নিজেকে বেশ মেলাতে পেরেছ। অর্থাৎ মৃত এক দাদার শ্বশুর-বাড়ীতে ট্যুইশনি করো, আমার মাসতুতো বোনের ননদের বাড়ীতে দিনান্তে একমুঠো ভাত খাও, আর দলিতোদ্ধার আশ্রমের ঘরখানায় নাকি রাত কাটাও। এ মন্দ নয়,—কোনোমতে জীবযাত্রার দেনা শোধ ক'রে চলা। সুখ দুঃখের চিন্তা নেই,—মনে হচ্ছে বাঁচবে অনেককাল। এম-এ পাস করেছিলে, কিন্তু লেখাপড়া শেখোনি। এবং বাঁচতে শেখোনি বলেই জীবনের কোনো শিকড়ও খুঁজে পাওনি।······

চিঠির পর চিঠি, কিন্তু সব চিঠিতেই বেদেনীর ওই নির্ভুল নিঃশঙ্ক কণ্ঠ,—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, অভিমন্যু। ভরা

গঙ্গা ছিলুম ভাদ্রে, এখন আমার আশ্বিনের শেষ—তটে বাঁধা দুই কূল। অকূলে ভাসবার মোহ্ থাকে ভরা বয়সে, এখন মোহ্ যদি বা আছে, মত্ততা নেই। গৃহিণী আর হ'তে পারিনে, হ'তে পারি সহ্ধর্মিণী। তোমার ধর্ম আছে কিনা জানিনে, কিন্তু তোমার চিঠির মর্ম বড়ই দুর্বোধ্য। তবে তোমার কাছে জীব্‌ধর্মই যদি বড় হয়, তবে হে ঠাকুর, রইলো তোমার ঝোলাঝুলি, আমাকে এবার বিদায় দাও।

বেদেনীর শেষ চিঠিখানা উল্লেখযোগ্য।—তুমি ভাগ্যের ক্রীড়নক। মানে, অপদার্থ। তুমি ঢেউয়ের দোলায় সেছ, যুগের হুজুগে মেতেছ। একদিন তুমি ছিলে দাহ্য, আমি দাহিকা; তুমি পাত্র, আমি বিষ। কী দুর্বল, অথচ কী দুর্লভ ছিলে তুমি, অভিমন্যু! রাজপথের উপর দিয়ে প্রবল আন্দোলনের স্রোত চলেছে,—আর ফুটপাথের ওপারে দাঁড়িয়ে এপারের দিকে চেয়ে আছি একাগ্রচক্ষে। ভাবতুম একটু কথা বলবো, একটু ব্যথা জানাবো। কিন্তু তুমি ছিলে নিষ্ঠুর তর্মী, পথটাই দেখতে, পথের এপারে দেখতে না। চোখ যেদিন খুললো, দেখলুম তোমার সঙ্গে চলতে যদি বা পারি, পাশে বসতে রাজি নই। সহযাত্রী হতে পারি, সহবাসী নই। আমার সব চেয়ে বড় ভুল, তোমাকে নিয়ে ঘরকন্নার হাস্যকর পরিকল্পনা। সেই ঘরে অন্ধ সুখ, মূঢ় তৃপ্তি,—তার অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে অস্থির ক'রে তুলতো। সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে তোমার সর্বব্যাপী প্রাণ আর আমার সর্বপ্লাবী

বন্যা বাঁধন মানবে কেন? সামান্য হাওয়ায় তাসের ঘর উড়ে গেল,—দুজনে সেদিকে চেয়ে খুশী হলুম।

অভিমন্যু, তোমার কণ্ঠে ছিল মাধুর্য, হৃদয়ে ছিল সঙ্গীত, কিন্তু তোমার গান ছিল আগাগোড়া ভাঙ্গনের, আগে আমি বুঝিনি। শৃঙ্খল মোচনের সাংঘাতিক সংগ্রামে তুমি মেতেছিলে, —কিন্তু আজ অবসাদ কেন জানো! তোমাদের প্রতিভা হোলো বাঙ্ময়, কর্মময় নয়। তোমাদের নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিশক্তি, সক্রিয় সৃষ্টিশক্তি নেই। তেজ আছে, বীর্য নেই; সখ আছে সখ্যতা নেই। যারা কেবল ভাঙ্গতে চায় তারা দানব, তারা জড়ো করে ধ্বংসস্তূপ, তাদের প্রবল অজ্ঞান কেবলই মৃত্যুমুখী, —তাদের সেই উন্মত্ত মনোবিকারকে প্রতিভা ব'লে ভুল করো কেন? তোমার মধ্যেও সেই আদিম অজ্ঞান, সেই নিশ্চেতন মানস, তাই তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের দরকার ছিল। তুমি জীবনের সুরঙ্গপথ চিনে রেখেছ, জেনে রেখেছ অন্ধকারে আনাগোনা।

অভিমন্যু, তোমার পথ চেয়ে রইলুম। সেই পথ, যেটা আমার চোখের আলো নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে। তার আগে সিন্দুর-কৌটো তুলে রাখলুম, হাতের নোয়া খুলে রাখলুম। ইতি—

তোমার বেদেনী

মোমবাতির টুকরোটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

চিঠিগুলো কোনো মতে জড়ো ক'রে অভিমন্যু একপাশে সরিয়ে রেখে দিল। তারপর ঘরের দরজায় তালা টিপে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। বেদেনী একদিন বলেছিল, উঠে আসতে পারো কি উদার তরুণ সূর্যালোকে রাজপথের ঠিক মাঝখানে? সামনে নতুন ফসলের ক্ষেত, দুকূলপ্লাবী দেশের প্রাণপ্রবাহ, নব নব আবিষ্কারের সম্ভাবনা, স্বচ্ছন্দ সাবলীল নির্বাধ স্বাধীনতা,—পারো এগিয়ে যেতে?

পারিনে।

কেন?

অভিমন্যু বললে, ফসলের মাঠ শুকনো, চাষীরা রুগ্ন। পেটে ক্ষুধা থাকলে তরুণ সূর্যালোক নিয়ে কাব্য করা যায় না! দারিদ্র্যের প্রবাহে প্রাণহীন দেহ ভাসমান! আর বলবো?

বেদেনী বললে, এটা সস্তা নৈরাশ্যবাদ, বেকারের অবসাদ। কাজ করতে যে জানে, সেই কাজ খুঁজে পায়।

হেমন্তের কুয়াশায় মহানগরের পথ আচ্ছন্ন। অভিমন্যুকে ঘিরে একদা পথে পথে কোলাহল ছিল,—আজ সবাই উঠেছে ঘরে, কেবল অভিমন্যুই রইলো পথে। এর জন্য তার চিত্তক্ষোভ নেই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎটা এই কুয়াশাচ্ছন্ন শূন্যলোকের মতোই যেন অস্পষ্ট। বেশ জানে অভিমন্যু, তাকে নতুন ক'রে আবার প্রস্তুত হ'তে হবে। এতকাল ধ'রে যে-কথা সে ব'লে এসেছে তা'র রং গেছে ধুয়ে,—তাতে

আর জৌলস নেই। ত্যাগ, নিষ্ঠা, জাতীয় আদর্শ, দেশপ্রেম —এগুলো ফাঁকির বুলি ; আসলে এই শব্দগুলোর ফাঁক দিয়ে প্রকৃত সত্যবস্তু বেরিয়ে যায়। একদা নির্বোধ স্বেচ্ছাসেবকেরা এই সব শব্দের ফাঁদে পা দিত। যেমন গড্ডলিকা আসে, ঠিক তারা তেমনি—মূঢ়, অর্বাচীন, অপোগণ্ডের দল। তারা মার খেয়েছে যত, প্রতারিত হয়েছে তা'র চেয়ে অনেক বেশী। তাদের কঙ্কালের চূর্ণ-অবশেষ দিয়ে ফসলের ক্ষেত উর্বর করা হোলো—সেই ফসল উঠলো আজ অনেক প্রতারকের ঘরে।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে অভিমন্যু যখন বকুলবাগানের বাড়ীতে এসে ঢুকলো তখন রাত আটটাও বাজেনি। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সামনেই কাকাবাবুকে দেখে সে একটু থতিয়ে গেল।

হীরেনবাবু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, এই যে, অভি—

আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথা চললেন ?

আমার ব্যাপারটা ত' জানো। নেমন্তন্ন পেলে আর পিছু তাকাইনে, বলতে কি অর্ধেক রাত্রেও ছুটে যাই। কিন্তু তোমার দশা কি হোলো হে ? বানের জলকে কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারলে না ? বাঁধ ভেঙ্গে পালিয়ে গেল ?

অভিমন্যু হেসে উঠলো। বললে, বানের জল বাঁধা পড়ে না।

সুমিত্রা এলেন হীরেনবাবুর প্রায় পিছনে পিছনে। সহাস্যে বললেন, প্রায় সাতদিন তুমি নিরুদ্দেশ। বেশ ত,

এইটিই ত' আমরা চাই। শুনলুম, তুমি নাকি সরকারী চাকরির চেষ্টায় আছো। এখন ত' তোমরাই সব, তোমাদেরই রাজত্ব,—চাকরি নিয়ে এবার সংসারী হও দেখি? নিজের ঘরটা এবার গুছিয়ে নাও ত বাবা?

অভিমন্যু বললে, আপনার যেমন অভ্যাস, কাকীমা—কখনও মন দিয়ে পরের কথাটা আপনি শুনতে চান্‌না। কে চাকরি নিচ্ছে, কোথায় চাকবি, কাদের রাজত্ব, কেই বা সংসারী হোলো না—সমস্তটাই আপনি খিচুড়ি পাকিয়ে দিলেন।

ওই নাও—সুমিত্রা শশব্যস্তে বললেন, ছেলের কথা শোনো। আমি বলি বুঝি মত বদলেছে। কেনই বা বদলাবে বলো, আর বদলালেই বা কে শুন্‌ছে? অভি, তুমি যতই বলো বাছা, গেরস্থ ঘরে তোমরা বেমানান,—আর কবেই বা গেরস্থ তুমি ছিলে? পুলিশেব চোখে ধূলো দিয়ে কেবল এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছ, কাজ করেছ তলায় তলায়,—আর কাজ বলতে অকাজই ত' বেশী!

কি বলছেন, কাকীমা—? মানে আমি ঠিক—

হীরেনবাবু বললেন, এইবাব বোঝো, যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। ওই শোনো কান পেতে, বাইরের ঘবে তর্কের ঝড় বইছে। হবে না? হবেই ত! এখন যে সবাই বেকার। কাজ হাসিল হয়ে গেছে, এবার দেশশুদ্ধ ছুটি! কিছু হবে না, এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। যাই, আমার আবার রাত হয়ে গেল ওদিকে। মানে, নেমন্তন্ন পেলে অর্ধেক রাতেও ছুটি।

হীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা বললেন, আচ্ছা ধরো তাই না হয় হোলো। কিন্তু এবার রণে ভঙ্গ দাও, বাছা! ফুটো ঘর ছেয়ে নাও? গুছিয়ে নাও নিজের? দেশে ভাত কাপড় নেই, তার ব্যবস্থা করো? ওই ত' দেখছি মুখখানি শুকিয়ে গেছে, কত ভাবনা চিন্তে! আমি বলি আর কেন! রামায়ণও সাতকাণ্ডে শেষ! আট কাণ্ড হ'লে কচকচি বেড়ে যেতো! যদি বলো স্বাধীনতা, কিন্তু কীই বা হাত পা বেরুলো!

ওদিকের দরজাটা এবার হঠাৎ খুলে গেল। তারপর পলকের মধ্যে একটি মেয়ে এলো বেরিয়ে। আবির্ভাবটা বৈদ্যুতিক, কিন্তু রাজোচিত। মন্দ উপমা দিতে গেলে বলতে হয়, পিঞ্জর থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এলো বাঘিনী। অভিমন্যু একেবারে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নাটকীয় আকস্মিকতার একটা চরম পরিস্থিতি বটে!

সুমিত্রা বললেন, ওই দেখো আমার কাণ্ড,—আসল কথাটাই ভুল। তপতী এসেছে আজ সকালে, কি যেন কাজে। আজই চ'লে যাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কেঁদে কেটে আমিই ধ'রে রেখেছি।...ওমা, কী মেয়ে তুই, তপতী? বসতে জায়গা দে অভিকে—? ওই যা, দুধ পুড়ে গন্ধ বেরিয়েছে—ক'দিক আর সামলাবো!—এই ব'লে তিনি ছুটলেন ভিতর দিকে।

দু পা এগিয়ে এসে তপতী হাসিমুখে বললে,. বসতে

আজ্ঞা হয়। পাদ্য অর্ঘ্য দেবো? আসন? পুষ্পচন্দন? তুমি কি আজকাল মৌনব্রত নিয়েছ?

অভিমন্যু ধীর কণ্ঠে বললে, আজকে এসে আজকেই চ'লে যাবার মানে? কোনো খোঁজখবর না দিয়ে—

তপতী আরো কাছে এসে বললে, মানে এই, দ্বিতীয় আকর্ষণ এমন কিছু নেই এখানে, যেজন্য থাকবো।

প্রথম আকর্ষণটি কি প্রকার?—অভিমন্যু হেসে ফেললো।

সে অনেক কথা, নাই শুনলে? ধ'রে নাও অনেকটা বেসরকারী আনাগোনা।

অভিমন্যু বললে, তোমার স্বাস্থ্য ভালো হোলো কেমন ক'রে?

তপতী এক ঝলক হাসলো। বললে, অপর্ণা বোধ হয় অন্নপূর্ণা হয়ে উঠলো! সাধনার পরে সিদ্ধি! অর্থাৎ চাকরিটা বেশ মনের মতন!

অভিমন্যু বক্রকণ্ঠে বললে, অর্থাৎ দেশের অন্নবস্ত্র এখন তোমাদেরই হাতে, এই ত?

তপতী বললে, বোকারা অনেকে তাই বলে বটে!

অভিমন্যু বললে, বাক্যবাণ বেশ শানিয়ে এনেছ দেখছি। সে যাই হোক, সরকারীভাবে কবে আসছো শুনি?

তপতী বললে, বোধ হয় আপাতত তার দরকার হবে না।

বাঙলা দেশ ছাড়লে?

ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি।

হেতু ?

তোমার কাছে অস্পষ্ট নয়।

সংসার পাতছো কোথায় ?

তপতী বললে, সব ঠাঁই মোর ঘর আছে !

মুখ টিপে অভিমন্যু বললে, একক ?

অনেকটা।

অর্থাৎ এখনো স্থির করোনি কিছু ?

তপতী বললে, ওটা অস্থির হয়েই থাক্‌।

অভিমন্যু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, বাইরের ঘরে মেয়েমহলে অত হট্টগোল কিসের ?

তপতী বললে, ওরা বিপ্লব শব্দটার মানে জানতে চায়।

তুমি কি বললে ?

উৎসাহিত হয়ে তপতী বললে, বেশ ভালো জবাব দিয়ে এসেছি।

অভিমন্যু বললে, কি শুনি ?

বললুম, বিপ্লব শব্দটার সর্বশেষ নির্ভুল ব্যাখ্যা শুনতে পাবে কলকাতার এক মোড়লের কাছে,—তাঁর নাম অভিমন্যু রায়।

বিদ্রূপটা অভিমন্যুর মনের অনেকদূর অবধি পৌঁছে গেল সন্দেহ নেই। এর পিছনে ইতিহাস যেটুকু আছে, সেটুকু জানে দুজনে। কিন্তু সে-আলোচনা কিছু কটু ও কষায়। মোট কথা, গত চল্লিশ বছরে বিপ্লব শব্দটার ব্যাখ্যা বদলেছে

বার বার। ওটার নির্ভুল অর্থ শুনলে ইংরেজ আতঙ্কিত হোতো, তাই ওটার ধার খইয়ে প্রায় চেতনায় এনে দাঁড় করানো হয়েছিল। এখন ইংরেজের দণ্ড নেই, তাই ওটাকে গঙ্গাজলে শোধন ক'রে আবার উচ্চারণ করা হচ্ছে। ওটা ছিল বোবার বোল্, এখন হয়েছে বুলি। যেটা দিয়ে একদা আঘাত করা চলতো, এখন সেটা দিয়ে আত্মঘাত করা চলে।

তপতী বললে, আমি এসেছি খবর পেলে কি ক'রে ?

অভিমন্যু বললে, মৃগনাভির গন্ধ ঢাকা থাকে না।

চোখের সামনে এলেই চাটুবাক্য—কেমন ? তোমাকে নাকি আজকাল মেয়েরা অন্তরঙ্গের মতন চিঠিপত্র লেখে ?

অভিমন্যু বললে, কে বললে তোমাকে ?

কোনো এক পাখী বলেছে কানে কানে।

তুমিও ত' একদিন প্রথম আমাকে চিঠি লিখেছিলে ?

কিছু একটা জবাব তপতী অবশ্যই দিত, কিন্তু সুমিত্রা তার আগেই এসে দাঁড়ালেন,—শুধু মুখে যেয়ো না অভি,—আর ওই অত বড় মেয়েকে নিয়ে কি অশান্তি আমার। একটু কি জ্ঞান-গম্যি হবে না ? ওই দেখো চ'লে গেলো হন্ হন্ ক'রে। তর্ক পেলে মেয়ে আর কিছু চাইবে না; দেশটা ভাসিয়ে দিলে তর্কে !

অভিমন্যু বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না—এখন আমার খাবার সময় নয়। এখনো জামাই ব'লে স্বীকৃত নই।

ওকথা বলতে নেই ! আচ্ছা, এখন না হয় নাই খেলে !

কিন্তু তোমাদের খাবার সময় সব সময়! পেট ভরা নেই ব'লেই ত' এত তর্ক! আমি সব বুঝি বাছা। ওই যা, চচ্চড়ি বুঝি ধ'রে গেল।—বলতে বলতে সুমিত্রা আবার ছুটলেন।

পায়ে চটি দিয়ে আড়াল থেকে তপতী বেরিয়ে এলো এবার। বললে, শিগগির চ'লে এসো। মা হয়ত আবার ছুটে আসবে।—এই ব'লে সে অভিমন্যুর আগেই হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে এলো।

পথে নেমে অভিমন্যু বললে, রেশমী শাড়ী জড়িয়ে এলে, শীত করবে না?

তপতী বললে, যদি করেই, তোমার হাওয়ায় নিশ্বাস নেবো!

কথাটা শুনতে সরস, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধে।

কেন?

অভিমন্যু বললে, তুমি যে আজকাল সর্বভারতীয়!

পানের দোকানের সামনে উজ্জ্বল আলোয় তপতী বাঁকা চোখে অভিমন্যুর দিকে তাকালো। হেসে বললে, কথাটা খুলে বলো, পরে আমি জবাব দেবো। সমস্ত ভারতবর্ষটা আমার, না আমি সমস্ত ভারতের সম্পত্তি!

অভিমন্যু বললে, দুই মিলে এক।

তপতী বললে, তাই যদি হয়, তবে এ মন্ত্র তোমার। একদিন আমার সম্বন্ধে তোমার বিহ্বলতা ঘটেছিল। সেদিন

তোমার সব কাজে আর কথায় ছিল রং। তুমি বলেছিলে, আমি যেন বিশ্ববিজয়িনী হই। কেন বলেছিলে বলো ত ?

অভিমন্যু একটু বিপন্ন বোধ ক'রে এদিক ওদিক তাকালো। বললে, কাল কি তোমাকে যেতেই হবে ?

হ্যাঁ, যেতেই হবে।

তা হ'লে জবাব শুনবে কখন্ ?

তপতী বললে, সামনে সমস্ত রাত রয়েছে, রয়েছে সমগ্র নগরের অন্ধকার নির্জনতা—। আগে বলো ত কোন্ দিকে যাচ্ছ ?

অভিমন্যু বললে, রাত ন'টার পর আমার পার্টি মিটিংয়ে যাবার কথা—

পার্টি মিটিং ? ও—ভুলে গিয়েছিলুম বটে, তুমি যে আবার ভিন্ন দলের লোক ! কিন্তু এ কী করছ তুমি, বলো ত ?

অভিমন্যু সোজা হয়ে দাঁড়ালো পথের ধারে। শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, আর কিছু জানতে চেয়ো না।

তপতী কিছুক্ষণের জন্য তাকালো তার দিকে। পরে বললে, কতদিন ধ'রে ভুল পথে চলতে চাও ?

যতদিন পর্যন্ত নিজের কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকবো !

সত্য !—তপতীর ওষ্ঠাধরে প্রায় হাসি এসেছিল।

অভিমন্যু বললে, হ্যাঁ, তোমার সত্য আমার সত্য এক নয়, তপতী !

তপতী বললে, সত্যটাও ত বদলায়। আজকের রাজ-

নীতিক সত্য কালকে ঝুটো হয়ে যাচ্ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছ না ?

একথা কি তুমি বিশ্বাস করো ?

তপতী বললে, পনেরো বছর আগে তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে এই কথাই তুমি বিশ্বাস করতে বলেছিলে।

ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে অভিমন্যু বললে, তবে তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধলো কেন ?

তপতী অতি ধীরে অভিমন্যুর একখানা হাত ছুঁয়ে বললে, বিরোধ ঘটেছে মত নিয়ে, পথ নিয়ে নয়। বিরোধ হোলো বিশ্বাসের প্রয়োগ নিয়ে। তর্ক সেইখানে।

বয়স ছিল কতটুকু ? হয়ত বছর পনেরো-ষোল হবে। কিন্তু মেয়েদের বয়স অপেক্ষা তাদের চেতনার ধার হোলো বিচার্য। বয়স হোলো মনের, বয়স হোলো রক্তের। ষোল বছরের মেয়েটির মধ্যে ছিল কী অগ্নিক্ষরা উত্তাপ, ...তিক হিংস্রতা। স্বাস্থ্যে ছিল বলিষ্ঠতা, দেহে ...াঠিন্য। একবার কোনো এক ছাব্বিশে জানু-...য়টি জনৈক ফিরিঙ্গি সার্জেন্টের হাতের ...য়ে, লোকটি ভারত-রমণীর কাঠিন্যের

...পি অভিমন্যুকে ডেকে বলে-...ম অমৃতসরের পথ থেকে।

তোমার কাকাবাবু সে সময়ে রেশম-কারবারের দালালী করতেন সেইখানে।

অভিমন্যু বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিল।

সুমিত্রা বললেন, জন্মটা ওর বাঙলায় নয়, কিন্তু ওর জন্মের পরিচয়ও আমি জানিনে, বাবা। পুলিশের গুলীতে কত লোক ম'রে গেল জালিয়ানওলাবাগে, আমরা যাচ্ছিলুম সোনার মন্দির দেখতে। সরু গলির ধারে ওকে কুড়িয়ে পেলুম,—মেয়েটার বয়স তখন হয়ত বছর খানেক। বেশ মনে পড়ে কোলে তুলে নিয়ে ছুটলুম দুজনে। চাঁদের টুকরো ভেঙ্গে পড়েছিল আমার কোলে!

অভিমন্যু বললে, তারপর, কাকীমা?

তারপর আর কি, কাকের বাসায় কোকিলের ছা মানুষ হতে লাগলো। লেখাপড়া শেখালুম, দেখতে দেখতেই পাস ক'রে বেরিয়ে এলো। কত মারলো, কত মারও খেলে। জেলে রইলো প্রায় তিন বছর, দল পাকালো রাস্তায়-রাস্তায়, বিষ ছড়ালো ঘরে ঘরে, কিন্তু ৫
অনেকগুলো। তারপর থেকে তুমি ত' জ
ওযে আমার মেয়ে নয়, একথা কেউ
বলে শিখের মেয়ে, কেউ বলে মুস
নোংরা কথাও বলে।

অভিমন্যু বললে, যে স
কথাও সত্যি নয়, কাকীমা।

অভিমন্যু বললে, সেই নোংরামিকে তবে তোমরা ক্ষমা করতে চাও কেন, তপতী? তারা পায়ের শিকল খুলে দিয়ে ফাঁদ পেতেছে দূরে গিয়ে,—তোমরা সেই ফাঁদে বার বার ধরা দিচ্ছ কেন? তুমি ত' জানো এ স্বাধীনতা আমরা অর্জন করিনি?

তপতী চুপ ক'রে রইলো।

অভিমন্যু বললে, নোংরামি ইংরেজের, বোকামি কি তোমাদের নয়? চেয়ে দেখো দেশের দিকে! তুমি দু'ভাগ করতে চাইলে, ওরা ক'রে গেল তিন ভাগ। তুমি ভাবলে এতেই বুঝি মিলন হবে! কিন্তু ওরা বীজ বুনে গেল চির-কালের বিচ্ছেদের। কে বলেছে আমরা শান্তির দ্বারা স্বাধীনতা পেয়েছি? মস্ত বড় মিথ্যে! কিন্তু একে পেতে গিয়ে যত খানি রক্ত পড়লো, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে গেলে এত রক্ত পড়তো কি? একথা স্বীকার ক'রে নাও শেষের দিকে তোমাদের সাহস, ধৈর্য আর দৃঢ়তার অভাব ঘটেছিল!

তপতী বললে, আজ একথা ব'লে লাভ কি, অভি?

অভিমন্যু হাসলো। বললে, বিশ্বাস করেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাসের যোগ্য মূল্য তোমরা দিতে পারোনি। প্রিয় সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য ভালো ডাক্তার ডেকেছিলুম, কিন্তু ভুল চিকিৎসার ফলে সেই সন্তানের অপমৃত্যু ঘটে গেছে। বুঝতে পারো তপতী, বুকের মধ্যে জ্বলে-পুড়ে যায় কি না? বুঝতে পারো, তোমাদের স্তোকবাক্যে লোকে কেন বিশ্বাস হারিয়েছে? পাঁচ বছর আগে জনপ্রিয়তার আশ্চর্য গৌরব ছিল

তোমাদের, তোমরাই ছিলে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা, কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে কী করেছ বলো ত ? ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে যথেচ্ছ বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছ, যার সাংঘাতিক ফলাফল চিরকালেব অভিশাপ চাপিয়ে দিল সকলের মাথায়। একে বলবে স্বাধীনতা ? বলবে স্বরাজ ? বলবে শৃঙ্খল মোচন ? কোটি কোটি লোকের স্নেহের উপরে ছিল তোমাদের আসন,—সেই স্নেহপ্রীতি কি অপমানিত হয়নি ?

তপতী শান্তকণ্ঠে বললে, ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ব'লে একে স্বীকার ক'রে নিচ্ছ না কেন ?

নেবো না—অভিমন্যু বললে, কেননা এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নয়, তপতী ! এটা তার বিকৃতি, এটা ইতিহাসেব ধারাবাহিকতার বিপরীত, এটা আত্মপ্রতারণা ! নদীর স্বাভাবিক গতি সাগরের দিকে, তুমি তাকে ফেরাতে চাও পর্বতের দিকে ! পূর্ব প্রাচ্যে চেয়ে দেখো ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ! ওদিকের উদয়াচলে সূর্য দেখা দেবেই,—লাল আভা ছড়াবে দিক্ দিগন্তে,—তুমি বাধা দেবে কোন্ শক্তিতে ? ওরা মার খেয়েছে সব চেয়ে বেশী, তাই ওদের অভ্যুত্থান সকলের আগে।

তপতী ধীরে ধীরে বললে, তোমার কথায় ভয় পাইনে, অভিমন্যু।

অভিমন্যুর রাত্রিযাপনের আড্ডায় ব'সে এতক্ষণ দুজনের আলাপ চলছিল। আলোটার ছায়া পড়েছে দেওয়ালে,—ক্ষীণ

দুর্বল আলো। ঘরের ভিতরটা দারিদ্র্যে মলিন, এলোমেলো অগোছালো কাগজের ভীড়, শয়ন ব্যবস্থাটা ভারতীয় দুঃখ-দুর্দশার প্রতীক, দেওয়ালের নানা অংশ থেকে বালির ধস পড়েছে—ঘরখানা অতি প্রাচীন।

রাত কম হয়নি, তপতীকে এবার উঠতে হবে। অভিমন্যুই তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে, এই প্রকার একটা আয়োজন চলছে মনে মনে। ওদের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে,—এখন যেন ওরা দুটি অভিমত, দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি। দুজনেই সম্মুখের দিকে গতিশীল, কিন্তু ভিন্ন যাত্রায় ধাবমান। অন্তরে মিল রয়ে গেছে কোথাও, কিন্তু বাইরে কোথাও মিলন সম্ভব হয়নি। তর্কে শেষ নেই, কিন্তু সান্নিধ্যেও ক্লান্তি নেই। আদর্শের দিক থেকে ওরা খুব কাছাকাছি, কিন্তু যুক্তির দ্বারা একজন আরেকজনকে রূপান্তরিত করতে চায়। এ ছাড়া আরো কিছু কথা আছে বৈকি, এর সত্য পরিচয় ওর কাছে অতি স্পষ্ট। এই যোগসূত্রটা কিসের? কাজ করেছে এক সঙ্গে, দুই ভাবনা মিলেছে একই ধারায়,—দুটি জীবন মিলেছে একই চেতনায়। এখানে ফাঁকি নেই,—সমগ্র যৌবনকাল ধ'রে একজন আরেকজনকে দেখেছে, জেনেছে। অত্যন্ত স্বচ্ছ জল, যেমন তার গভীর নীচেটা দেখা যায়! এর আয়নায় ওর প্রকৃতির প্রত্যেকটি রেখা প্রতিফলিত। সম্পর্কটার প্রথম দিকে ছিল অনুরাগ, সেটা নিবিড়, সেটা একাগ্র ও অনিমেষ,—তারপর এসেছে ভাবস্থিতি, যাকে

বলে যোগনিবেশ। অভিমন্যুর জাহাজ ভেসে চলেছে তরঙ্গ-মথিত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, কিন্তু স্বাধীন শ্বেতপক্ষীটি যেখানেই থাকুক—উড়ে-উড়ে বার বার এসে বসেছে তার মাস্তুলে; সে-পাখী কোথাও পথ হারায়নি, কখনও দৃষ্টি এড়ায়নি। অনেক সময় মনে হয়েছে এ যোগ অবিচ্ছেদ্য। জীবনটা অশান্ত, যৌবনকালটা নানা ঘটনায় বিপর্যস্ত,—কত ভগ্ন আশা, মিথ্যা আশ্বাস, ব্যর্থ কল্পনা, কত আলো আর অন্ধকারের আলোড়ন,—কিন্তু এক জায়গায় অনির্বাণ অকম্প শিখা জ্বলছে স্থির হয়ে তা'র অদম্য জ্বলৎশক্তিতে। সেখানে অভিমন্যু কখনও ভুল করেনি, তপতীর কখনও ভ্রান্তি ঘটেনি।

অভিমন্যুকে যেতে হবে, সেজন্য তা'র মনে একটু অস্বস্তি ছিল। অনেকদিন পরে পাওয়া গেছে তপতীকে, হয় ত অনেকদিন পরেও সহজে আর পাওয়া যাবে না। সে কাছের মানুষ, কিন্তু থাকে অনেক দূরে। দূর গেলে সে যেন আরো কাছে আসে। সান্নিধ্যের প্রতি হয়ত তার আসক্তি কম; সাহচর্যের জন্য তার মনে উদ্বেগ নেই! কেন নেই! —এ প্রশ্ন অভিমন্যুর মনে জেগেছে অনেকবার।

অভিমন্যু এবার ডাকলো, বেদেনি!

সারাদিনের ক্লান্তিতে তপতী এবার একটু আড় হয়ে পড়েছিল। সচকিত হয়ে সে জবাব দিল, এবার বুঝি তাড়াতে চাও?

হ্যাঁ,—অভিমন্যু বললে।

যাচ্ছি, ভয় নেই। রাত দুপুরে এসে তোমার ঘর দখল করিনি। আচ্ছা, তোমার এখানে এলে ঘুম পায় কেন, বলো ত?

অভিমন্যু বললে, আলোটা খুব উজ্জ্বল নয়, বোধ হয় তাই জন্যে।

তপতী বললে, সেজন্যে নয়। তোমার এখানে এলে সব কাজ ভুলে যাই। এ ঘরের বাইরে যেন খোলসটা ফেলে আসি। এ কেন হয় বলো দেখি?

অভিমন্যু বললে, হয়ত তোমার চেতনাটা অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

বুঝিনে।—তপতী বললে, তোমাকে ছেড়ে গিয়েই বা কি পাই, তোমার কাছে এসেই বা কি হারাই!

আচ্ছা, বেদেনি—?

তপতী বললে, থতিয়ে যাও কেন, স্পষ্ট বলো।

কাল কি তোমায় যেতেই হবে?

সেটা কালকের কথা। আজকের কথা কি কিছু নেই?

অভিমন্যু বললে, আমাদের জীবনে আজ নেই, সবটাই আগামীকাল। যা হয়ে উঠেছি তা বড় নয়, যা হ'তে পারি সেইটেই বড়।

দরজাটা ভেজানো ছিল, বাইরে থেকে কে যেন মৃদু গলায় ডাকলো। গলিপথটা এদিকে এসে বন্ধ হয়ে গেছে, সেজন্য রাত্রের দিকে এ-গলিতে লোক চলাচল কম। 'গলার

আওয়াজ পেয়ে তপতী সোজা হয়ে গুছিয়ে বসলো। বললে, কে ?

অভিদা আছেন ?

অভিমন্যু সাড়া দিয়ে বললে, ভেতরে এসো, অজয়।

একটি ছোকরা ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তপতীকে দেখে হঠাৎ একটু জড়োসড়ো হয়ে অজয় বললে, আপনাকে একবার যেতে হবে।

অভিমন্যু বললে, ওদের কোথায় রেখেছ ?

অজয় জবাব দিচ্ছে না দেখে অভিমন্যু পুনরায় বললে, তপতী চৌধুরীকে কি তুমি চেনো না অজয় ?

অভিমন্যুর কণ্ঠে চাপা তিরস্কারের আভাস ছিল। অজয় তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে তপতীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, একদিন তপতীদিই ত' আমাকে কাজে নামিয়েছিলেন, কিন্তু আজ উনি ভিন্ন দলে। আমাকে ক্ষমা করুন—

তপতী বললে, দলের চেয়ে দেশ বড়, অজয়।

অজয় স্তব্ধ নতমুখে দাঁড়ালো। অভিমন্যু বললে, পুলিশ গুলী চালিয়েছে জানি। হাসপাতালে ক'জন ?

জন তিনেক—অজয় বললে।

বাকিরা কোথায় ?

আপনি গেলে একবার ভালো হয়।

অভিমন্যু বললে, খুলেই বলো না ? তোমাদের তপতীদি গোয়েন্দা নন্।

অজয় বললে, দশ নম্বরে পনেরো জনকে আনা হয়েছে। তাদের একজনের অবস্থা ভালো নয়।

চলো যাচ্ছি।—

অজয় নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

তপতী বললে, আজকাল আমাকে তোমার সঙ্গে দেখলে তোমার নিন্দে রটতে পারে ত ?

নিন্দে ? কিসের ?

চরিত্রের ! আমাদের গান্ধর্ব বিবাহের খবরটা কি ওরা জানে ?

অভিমন্যু বললে, না, জানে না। কিন্তু তুমি কি নারীঘটিত নিন্দের কথা বলছ ?

তপতী বললে, হ্যাঁ গো, যাকে বলে নৈতিক চরিত্র !

ওটায় ওরা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে না। ওরা কেবল বোঝে নিয়মানুগত্য। ওরা ছাঁচ বোঝে, স্বাতন্ত্র্য বোঝে না।

তপতী বললে, এইটেই ত' নিয়মের ব্যতিক্রম, অভি ?

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। অভিমন্যু ঘরে তালা টিপে দিয়ে বললে, এ আলোচনা সহজে শেষ হবে না, বেদেনী ! তবে এটুকু জেনে রাখো, নিয়মকে ভাঙ্গতে গেলেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। চলো, তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি যাই আমাদের গুহাহতগহ্বরে।

আবার ওরা পথে এসে নামলো।—

সকালের সূর্যের আলোটা বাঁকা হয়ে পড়েছে ঘরের জানালা দিয়ে। অভিমন্যু উঠেছিল প্রত্যূষে, যেমন অভ্যাস, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আবার এসে শুয়েছে। কাল রাত্রে মধুর ঠাণ্ডা পড়েছিল, বুঝতে পারা যায় সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটছে,…অর্থাৎ কলকাতায় দেখা দিল এবার রাজনীতিক আন্দোলন আর শোভাযাত্রার ঋতু। অভিমন্যু আজ ট্যুইশনি করতে গেল না; শিক্ষকতায় কোথায় যেন এসেছে ক্লান্তি। সেই গতানুগতিক ভ্রান্ত অর্থনৈতিক বুলি,—যে-শাস্ত্রটা ধনতন্ত্রীর সুবিধার্থে প্রস্তুত। এদেশে চল্‌তি সমস্ত আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রটাই ভুল নীতিতে ভরা—যেটার ব্যাখ্যা দরিদ্র দেশে হয় না। এ নীতি ইংরেজের সুবিধের জন্য তৈরী ছিল।

সকালের আলোটা বেশ উৎসাহজনক। তরুণ সূর্যালোকে কেমন যেন সুদূর আশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়। নৈরাশ্য, ক্লান্তি, অবসাদ—এদের স্থান নেই অভিমন্যুর জীবনে। অঙ্কের নির্ভুল পরিণতির মতো তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তা'র কাজ অনেক। আর কিছুকাল যাবত অগ্রসর হয়ে তাকে সাগর তরঙ্গের সম্মুখীন হ'তে হবে। এটা তার প্রস্তুতির কাল। হয়ত মৃত্যু আর ধ্বংসের ভিতর দিয়েই তা'র পথ, হয়ত বা সাংঘাতিক বিয়োগান্ত নাটকের ভিতর দিয়ে। একদিন কোনো এক নামজাদা নেতা তার সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছিলেন। অভিমন্যু বললে, পথ ভুল আমরা করিনে। আমাদের কাজের নক্সা আগে থেকেই তৈরী থাকে। আপনাদের মনোবৃত্তি আমরা

অঙ্ক ক'ষে বার করি। দু'বছর পরে আপনারা কি করবেন তা আমরা জানি।

ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের সমস্ত ব্যাপারটাই ত' বিজাতীয়!

ক্ষমা করবেন, জাত আমরা মানিনে।

কিন্তু জাতীয়তা?

সোনার পাথরবাটি!

ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, দেশের মানুষকে আপনারা যন্ত্র বানাতে চান্, না পশু বানাতে চান্?

অভিমন্যু হাসিমুখে বললে, আপনাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যেকটি দরিদ্র ব্যক্তিকে অস্ত্র বানিয়ে তুলতে চাই।

উদ্দেশ্য?

অতি পরিষ্কার!

ভদ্রলোক আর কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর মুখ চোখের চেহারা মনে পড়ে গিয়ে আজ সকালে অভিমন্যুর মুখে হাসি দেখা দিল।

বাইরে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই তপতী এসে ঢুকলো ঘরে এবং ড্রাইভার এসে দিয়ে গেল একটি বিছানা ও সুট্‌কেশ। তপতীর হাতে টিফিন্ ক্যারিয়র।

ভিতরে এসে তপতী নিজেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, ছেঁড়া মাদুরও ছাই একখানা রাখোনি? ভদ্রলোকদের বসতে দাও কিসে?

অভিমন্যু বললে, যারা আসে তারা দলের লোক, ভদ্র-লোক নাও হতে পারে। কিন্তু এমন অতর্কিত আক্রমণের হেতু ?

মুখ টিপে হেসে তপতী বললে, যাবাব আগে বিদায় সম্ভাষণের পালা। পালাটা তোমার এই একলা ঘরেই সেরে যাবার ইচ্ছে। প্রাণের দায়ে তাই ছুটে এলুম মাকে মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে।

কতকগুলো খবরের কাগজ একত্র ক'রে তপতী মেঝের উপর ছড়িয়ে পাতলো। তারপর টিফিন্ ক্যারিয়র খুলে রাশি পরিমাণ সুভোজ্য বা'র করলো। বললে, আজ শেষ-রাত্রে উঠেছি নিজের হাতে খাবার তৈরী করবো ব'লে। তোমাকে খাইয়ে তবে যাবো।

অভিমন্যু বললে, হঠাৎ আদিম নারীপ্রকৃতি জেগে উঠলো কেন ?

তপতী বললে, বিবেক দংশনের ফলাফল ! নাও, বসো।

চুলের রাশি তা'র ঝ'রে পড়েছে কর্ণমূল থেকে মেঝের উপর। সাবানের মৃদুগন্ধ তা'র সর্বাঙ্গে। কপালের কয়েকগাছি হাল্‌কা চুলের সঙ্গে ঘামের বিন্দু জড়ানো। আয়ত চোখে উদ্দীপনার আভা। গলায় সরু চিকন সোণার হার। তপতীর বয়স কোনদিন বাড়লো না।

অভিমন্যু বললে, এখন কি খাবার সময়, না এত খাওয়া যায় ?

তপতী রাগ ক'রে বললে, সময় অসময়ের জ্ঞান তোমার যদি এতই বেশী, তবে কাল অত রাত্রে আমাকে ঘর থেকে তাড়ালে কেন ? আমি বাঘ, না ভাল্লুক ?

সবিস্ময়ে অভিমন্যু বললে, তপতী, এ কি ছেলেমানুষী তোমার ? আমি তাড়ালুম ? তোমার কি তখন যাবার সময় হয়নি ?

তপতী এবার খুব হেসে উঠলো। বললে, হ্যাঁ যাবার সময় হয়েছিল বটে। কিন্তু যাবার জন্য কি এসেছিলুম তোমার এখানে ? এঘরে আলো নিবিয়ে কি আমার থাকার অধিকার ছিল না ?

অভিমন্যু তা'র মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকালো। পরে বললে, এ কি তোমার সত্যিই তামাসা নয় ?

খাবারের বৃহত্তর অংশটা তপতী সহাস্যে অভিমন্যুর দিকে বাড়িয়ে দিল। কী যত্ন তা'র নিটোল হাতখানিতে, কী লাবণ্য তার বিলোল আঙ্গুলগুলিতে। কেমন এক প্রকার মূর্চ্ছনা তার মধুর ভঙ্গীতে, সঙ্গীতের ঝঙ্কার তা'র আচরণের ইঙ্গিতে।

সুস্বাদু আহার মুখে তুলে অভিমন্যু বললে, একটা কথা বলবো, বেদেনী ?

তপতী বললে, কোন্ কথাই বা বলতে বাকি রেখেছ ?

কিন্তু সেকথাটা বলিনি কোনোদিন।

এক তাড়া ছাপাখানার কাগজ কাছে প'ড়ে ছিল, সেইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে তপতী বললে, কী এমন কথা ?

অভিমন্যু বললে, সম্প্রতি তুমি যেন একটু চটুল হয়ে উঠছো।

হুঁ—ব'লে তপতী কাগজগুলি ওল্‌টাতে লাগলো।

উত্তর দিচ্ছ না যে ?

তপতী একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, বোধ হয় বয়সের সঙ্গে কিছু একটার জন্যে আকুলতা বেড়েছে, তাই জন্যে !

অভিমন্যু প্রশ্ন করলে, তার মানে ?

অনেকগুলো ভালো খেলা বাকি রয়ে গেল, তা'র জন্যে আক্ষেপ কি কম ?

অভিমন্যু এবার নতমুখে চুপ ক'রে রইলো। কাগজগুলি নাড়াচাড়া ক'রে তপতী একসময় বললে, এগুলি কি তোমারই লেখা ?

অভিমন্যু বললে, হ্যাঁ আমারই। তবে পুলিশকে জানতে দিইনে।

তপতী বললে, যা লিখেছ একি তোমার নিজের অভিমত ?

সেজন্যে আমার কোনো আড়ষ্টতা নেই, বেদেনী !

তুমি কি এসব বিশ্বাস করো,—এই সব আত্মঘাতী নীতিতে ?

অবশ্যই।

আহারাদি শেষ ক'রে তপতী বললে, চলো আমার সঙ্গে এখনই তোমাকে যেতে হবে।

অভিমন্যু প্রশ্ন করলো, কোথায় ?

আমি যেখানে যাচ্ছি।

অভিমন্যু একটু উত্তেজিত হোলো। বললে, যদি বলি আমিও যাবো না, তোমাকেও যেতে দেবো না?

তপতী বললে, কোন্ শক্তিতে এ অধিকার তুমি নিতে চাও?

যে-শক্তিতে একদিন তোমার মতন কঠিন নারীকে আকর্ষণ করেছিলুম? যে-শক্তিতে একদিন তোমার কানে ইষ্টমন্ত্র দিতে পেরেছিলুম?

তপতী কঠিন কণ্ঠে বললে, সেই ইষ্টমন্ত্রের জোরে আমি এগিয়ে চলেছি, কিন্তু তোমাকে পুড়িয়ে ছারখার করছে তোমার নিজের শক্তি। সেই ধ্বংসের মধ্যে তোমাকে ফেলে যেতে আমি পারবো না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অভিমন্যু কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো দরজার ধারে।

কে?—তপতী ফিরে তাকালো।

মেয়েটি ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তারপর অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললে, প্রুফটা দেখে রেখেছেন?

অভিমন্যু বললে, হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমি দেখে দিয়েছি।

তপতী কাগজপত্রগুলি এগিয়ে দিল। মেয়েটি সেগুলি তাড়া বেঁধে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালো, অভিমন্যু বললে, রেণু, ছাপাখানায় ব'লে দিয়ো, অন্তত দশ হাজার পুস্তিকা ছাপা হবে। কিন্তু, সাবধান···বুঝেছ?

যে আজ্ঞে—ব'লে রেণু একবার অলক্ষ্যে বাঁকা চোখে তপতীর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তপতী হেসে বললে, রেণুর চোখ দুটো পিছন থেকে আমার পিঠের উপর যেন বিঁধছিল!

অভিমন্যু বললে, ওকে চেনো?

তপতী আবার হেসে উঠলো। বললে, নিজের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে অন্যের নিন্দে রটিয়ে বেড়ায় এমন অনেক মেয়েকেই চিনি।

অভিমন্যু বললে, তোমার ট্রেনের সময় হয়নি?

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে যাবো, অভি।

ছেলেমানুষী করো না, বেদেনী!

তপতী বললে, যতদিন বাঙলায় ছিলুম, নরম ছিলুম। এখন পশ্চিমের জল-হাওয়ার গুণে খুব শক্ত হয়েছি, তা জানো? তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। এখানে আর তোমার থাকা হবে না।

কোন্ চুলোয় তা ত' বললে না?

না, সেকথা জানবার দরকার নেই। এখানকার পাপ-চক্রান্ত থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো। তুমি তিলে তিলে নষ্ট হবে, এ আমি বরদাস্ত করতে পারবো না। চলো, এবার কাজ করবে, গ'ড়ে তোলবার দিকে মন দেবে।

কী গড়বো?

তপতী বললে, গড়বে তোমার নিজের মন। ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন,

বিক্ষিপ্ত মন একত্র কুড়িয়ে নতুন জীবন গ'ড়ে তুলবে চলো। তুমি ত দেখছ, আজ সব চেয়ে বড় বিপদ হোলো নৈতিক সঙ্কট!

অভিমন্যু তপতীর দিকে তাকালো। সকালের আলোর আভাটা তপতীর মুখের উপরে কেমন যেন আশ্চর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

তপতী বলতে লাগলো, এ সঙ্কট তোমার আমার সকলের। লোভে অন্ধতায় মত্ততায় দেখতে পাচ্ছ না পায়ের তলাকার মাটি স'রে যাচ্ছে? অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়—এদের অভাবের জন্য দেশজোড়া অরাজকতা আনবার চেষ্টা করছ, কিন্তু ইংরেজ আমলে এগুলোর এত অভাব ছিল কি? তখন কিসের জন্যে শোভাযাত্রা বা'র করেছিলে পথে পথে! লাঠি আর গুলী সয়েছিলে কেন? কিসের জন্যে নিত্য লাঞ্ছনা আর অপমান মাথায় পেতে নিতে? তাদের প্রত্যেকটি আইনের বিরুদ্ধে কেন দেশজোড়া প্রতিবাদ তুলতে? সে কি কেবল ভাত কাপড়ের জন্যে? অরাজকতা আনতে চাইলে ঠিকই আসবে, কিন্তু তা'তে ভাত কাপড়ের অভাব ঘুচবে কি? এই ত' তোমার কাগজপত্র দেখলুম! দেখতে পেলুম তোমাদের প্রবৃত্তির চেহারা। ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, হিংসা,—এই ত' তোমাদের প্রচার কার্য। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগাতে চাইছ। তাদের লোভ, ক্ষুধা, পাশবিকতা,—এই নিয়ে তোমাদের কারবার। শ্রেণী সংগ্রামের ধুয়ো তুলেছ, গড়তে চাইছ শ্রেণীহীন সমাজ-

ব্যবস্থা! তা'র মানে কি? বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, চাষী, মজুর, রাজনীতিক, শাসক, যান্ত্রিক—এরা কি শ্রেণী নয়? এক পাল গরুর মধ্যে কোনো শ্রেণী নেই,—কিন্তু ওদের মধ্যে যে গরুটি দুগ্ধবতী তাকে আমরা বলি গোমাতা! শ্রেণীহীন সমাজ মানে কি? মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে, মানব জাতির সৃষ্টি যতদিন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানেই ত শ্রেণী! পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর, মানুষ জন্মেছে মরেছে অযুত কোটি। কে খবর রেখেছে তাদের? কেনই বা রাখবো? জন্ম মৃত্যুর বন্যায় তা'রা এসেছে, চলেও গেছে। কিন্তু স্মরণীয় তারা যাদের নাম সক্রেটিস, যাদের নাম রবি ঠাকুর। এরা হোলো শ্রেণী, শ্রেণীহীন নয়!

অভিমন্যু বাধা দিয়ে বললে, তোমার গাড়ীর সময় হোলো, বেদেনী।

তপতী বললে, জবাব দাও, অভি?

না, দেবো না। আগাগোড়াই তোমার ভ্রান্তি; এ জাতীয় সস্তা সমালোচনার কোনো জবাব নেই, বেদেনী!

তুমি আমার কথা শুনবে না?

পাখী-পড়া বুলির দাম কতটুকু?

তপতী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, এখানে তোমার এখন কী কাজ?

অভিমন্যু বললে, বাঙালী কাজ করে না, তারা আইডিয়া যোগায়। কর্মীর কানে তারা মন্ত্র দেয়, মন্ত্রণা যোগায় ভারতকে।

তোমার মন্ত্রণা যদি যুক্তিহীন হয় ?

অভিমন্যু হাসলো। বললে, ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম হোলো বাঙলায়, যুক্তি নিয়েই আমাদের কারবার। বাঙলার সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি—এই তিনটে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুক্তির উপরে। চেয়ে দেখো বাঙলীর স্বীকৃতি না পেলে ভারতের কোনো নেতার অন্ন জোটে না। সমস্ত ভারতে যে-নেতা হাততালি পায়, বাঙলার কষ্টিপাথরে তাকে ঘষো, দেখবে তার অনেকখানি হয়ত ভূয়ো। অনেক নেতা বাঙলার পরে রুষ্ট, কেননা বাঙালীর বিশ্লেষণ-শক্তিতে তাদের ধাব হয়ত ক্ষয়ে যায়। অনেকে বাঙালীর বিচারকে ভয় করে, তাই অশ্রদ্ধাও করে। চেয়ে দেখো বাঙলা থেকে যে-নেতা মাথা তুলে ওঠে, ভারতে তার সমাদর অনেকখানি কম। কেননা বাঙালীর যুক্তির সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না ব'লেই বিদ্বেষ ও বাধায় তা'র পথ অবরোধ করে। আমার মন্ত্রণা যদি সত্যিই যুক্তিহীন হয়, তবে সব চেয়ে বেশী শাস্তি একদিন বাঙলা থেকেই পাবো।

তপতী এবার উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট হাতঘড়িটির দিকে তাকিয়ে সে একবার জানলার ধাবে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর অকারণে একবার সমস্ত ঘরখানায় পায়চারি ক'রে নিল। অতঃপর অভিমন্যুর পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে বললে, মনে করেছিলুম পনেরো বছর পরে কিছুদিনের জন্যেও অন্তত স্বস্তি পাবো, কিন্তু তাও তুমি আমাকে দিলে না।

অভিমন্যুর মুখখানা একটু লজ্জাভ হয়ে উঠলো, এটা তোমার অভিমান, না আবেদন,—ঠিক বুঝিনে, বেদেনী!

তপতী বললে, দুটোর একটাও নয়। বলতে পারো এটা আমার আত্মগ্লানি!

আত্মগ্লানি! কেন?

কাছে এলে ছুটে পালাতে হয়, দূরে গেলে ছুটে আসতে হয়! এই আসা-যাওয়ার গ্লানি তুমি বুঝতে পারো?

অভিমন্যু বললে, কিন্তু এ গ্লানি থেকে তুমি ত' মুক্তি নিয়ে গেছ?

উত্তেজনায় তপতীব গলা কেঁপে উঠলো। বললে, মুক্তি নিতে চাই, পাইনে। কেননা আসল মুক্তি হোলো মনের। নিজের মনেব নাগাল পাই কোথায়?

কিন্তু তুমি ত জানিয়ে গিয়েছিলে তোমার সঙ্গে কোথাও আমার মিললো না?

এখনো জানাচ্ছি—তপতী বললে, কখনো মেলেনি, কোনো-দিন মিলবেও না!

তবে?—অভিমন্যু সহসা সোজা ঘাড় ফিরিয়ে তপতীর মুখের দিকে তাকালো।

তপতী বললে, যদি পারো বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও, সেই আমার পরম মুক্তি! আমার বিশ্বাস নিয়ে আমাকে তুমি দাঁড়াতে দিচ্ছ না, আমার বুদ্ধি বিচারকে ক'রে তুলছ অবশ। বুঝতে পারিনে কোথায় তোমাকে কিসের বন্ধনে বাঁধবো।

তোমার মনের আকাশে মুহুর্মুহু রং বদলায়,—কোনো বর্ণ তোমার স্থায়ী নয়। আমি কি জানতে পারলুম তোমার প্রকৃত স্বরূপ, আমি কি দেখতে পেলুম তোমার মনের অলি-গলি? কিছুতেই মিলছে না তোমার সঙ্গে আমার! যদি কিছুতেই না মেলে তবে কেন আমরা এলুম একই যুগে একই আইডিয়া নিয়ে। মিললো না ব'লে তোমার গলা ধ'রে কাঁদবো, সে ত' ছেলেমানুষী! বিচ্ছেদ ঘটলো ব'লে বৈরাগ্য নিয়ে দূরে চ'লে যাবো সেও ত' নাটুকেপনা। কিন্তু মাঝপথে পা ছড়িয়ে ব'সে থাকবো কতক্ষণ?

অভিমন্যু বললে, তুমি কলকাতায় এলে কেন?

তপতী এবার হাসির স্ফুলিঙ্গ ছিটকিয়ে দিল। বললে, প্রশ্ন কিছু করো না। ওটা মেয়েমানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা!

তুমি ত' সাধারণ মেয়ে নও?

আমাকে গাছে তুলো না, অভিমন্যু!

অভিমন্যু বললে, তবে কি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলে?

তপতী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, পরীক্ষায় ফেল্ করেছি। এবার একখানা গাড়ী ডেকে দাও।

এই যে বললে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

এত বড় গুরুভার আমার সইবে না।

আবার কবে আসবে?

তোমার মতের পরিবর্তন হবে যেদিন।

অভিমন্যু বললে, অর্থাৎ বলতে চাও আর কোনোদিন দেখা হবে না ?

তপতী রাগ ক'রে বললে, এবার বুঝি হৃদয়াবেগের ওপর সুড়সুড়ি দিতে চাও ?

না চাইনে—অভিমন্যু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সংস্কারের বন্ধন আমি মানিনে, দাসত্ব করিনে চিত্তবৃত্তির। তোমাকে দূরেও ঠেলবো না, কাছেও ডাকবো না। দুজনের দুই নদী বয়ে যাক্ পাশাপাশি, দেখা হবে সমুদ্রের মোহানায়। লক্ষ্য-স্থল এক, পথ কেবল আকাবাঁকা। কিন্তু তুমি কি পৌঁছবে সমুদ্রে ? জানিনে, জানতে চাইনে। তবে যত বাধা, যত বিপত্তিই হোক, আমি চাইবো মিলতে। দাঁড়াও, গাড়ী ডেকে আনি।

অভিমন্যু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেদেনী দাঁড়িয়ে রইলো জানলায় হেলান দিয়ে। বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে অভিমন্যু, স্বচ্ছ জলকে ঘোলা ক'রে দেয়। পথ খুঁজে পায়, সে যখন একা। পথ ভুলে যায় সে অভিমন্যুর পাশে এসে দাঁড়ালে। দুবছর আগেও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, সেই ধারণাই তাকে পরিচালিত ক'রে এসেছে। পিছনের তপতীর ঠেলায় সামনের বেদেনী এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু অভিমন্যু ব'সে গেল আবার নতুন পরীক্ষা নিয়ে। সে জীবন-তপস্বী,—আবর্তে, প্রবাহে, তরঙ্গে, তুফানে সমস্তটার ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে চলবে।

দুস্তর দুঃখ সে খুঁজে বেড়ায়, নিত্য নূতন মন্ত্রের সন্ধানে সে ঘোরে। অভিমন্যু এগিয়ে চলেছে সর্বনাশের দিকে সজ্ঞানে, সচেতন বুদ্ধি নিয়ে—সেদিকে ধ্বংস, অপচয়, অপ-মৃত্যু,—সে-পথ অরাজকতার পথ, স্থিতিশীলতার পথ নয়। তার চোখের সামনে রয়েছে বিরাট একটা নতুন নক্সা, একটা অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। সেটা ভালো কি মন্দ, সেটা কল্যাণকর কিনা, প্রযোজ্য কি না—এ চিন্তা তার নেই। কিন্তু সেটা চল্‌তি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা, সেটার আস্বাদ যে বিচিত্র, সেটা যে মৌলিক কল্পনার একটা বিরাট পরীক্ষা,—এই চিন্তাই তাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে।

মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অভিমন্যু গাড়ী এনেছে, এবার যেতে হবে। তপতী সচকিত হয়ে জানলার ধার থেকে সরে এলো।

অভিমন্যু ভিতরে এসে বললে, চলো। কাল থেকে যেন একটা মনোবিকারের মধ্যে আছি, এবার নিষ্কৃতি।

বিছানা ও সুটকেস নিয়ে অভিমন্যু বেরিয়ে এলো। তপতী পিছনে পিছনে এসে গাড়ীতে উঠলো। বাইরে থেকে অভিমন্যু বললে, একা যেতে অসুবিধে হবে না? টিকেট করেছ?

তপতী বললে, দাঁড়াও, কোথাকার টিকিট করবো বলো ত?

বাঃ, কি ভাবছো বলো দেখি? কোথায় যাবে তাও হুঁস নেই? যাবো তোমার সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত?

তোমার সামনে দিয়ে ট্রেনে উঠতে পারবো না, অভিমন্যু!

অভিমন্যু সবিস্ময়ে বললে, কেন?

কেন! সমস্ত রাজনীতির বাইরে এর জবাবটা যে প'ড়ে রয়েছে!

অভিমন্যু হতচকিত হয়ে বললে, তবে কেন বার বার অবাধ্য হয়ে চ'লে যাও?

অসম্বৃত কণ্ঠে তপতী ব'লে উঠলো, না না, কি বলতে কি বলেছি। না, পারবো না আমি, অভি। আমি, সামান্য মেয়ে, কিন্তু আমার জীবনেও একটা স্বতন্ত্র আদর্শ রয়ে গেছে। তাকে জলাঞ্জলি দিতে পারবো না নিজের দুর্বলতার কাছে। ড্রাইভার, গাড়ী চালাও।

তপতীর গাড়ী ছুটে বেরিয়ে গেল।

তপতীর মনশ্চাঞ্চল্যের ইতিহাসটা অভিমন্যুর অজানা নয়। মাত্র পনেরো ষোল বছরের মেয়ে,—সোনার স্বপনে বোনা সেই চোখ,—সেই চোখে আকাশের নীলাভ ভাষা। অভি-মন্যু একদিন তাকে পথ থেকে প্রায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। ওই বয়সে মেয়েদের হাতে অন্তত একগাছি কাচের চুড়িও থাকে, থাকে কানে, থাকে হয়ত কিছু একটা গলায়। তপতীর সেদিন কোনো আভরণ ছিল না,—ছিল কঠিন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, ছিল সুকুমার দেহের রক্তাভ শ্বেতবর্ণ। শুষ্ক চুলের রাশ বেণীবদ্ধ, চিবুকে পুরুষোচিত দৃঢ়তা, আচরণে

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। তাকে দেখে অভিমন্যু পলকের মধ্যে ঠাহর করতে পেরেছিল, এ মেয়ে সাধারণ ক্ষণভঙ্গুর নয়। একে হাতে নেওয়া যায় চাবুকের মতো ব্যবহারের জন্য।

কিন্তু এ সবই বাইরের, ভিতরে একটা ভাষা ছিল,—সেটা বাইরে এসে পৌঁছেছিল অনেকদিন পরে। দুজনেই তখন জেল্ থেকে বেরিয়ে আবার কাজে নেমেছে। বলা বাহুল্য, সে-ভাষা যৌবনের জারকরসে কিছু সিক্ত।

অভিমন্যুর পিছনে কর্মীর দল ছিল, ছিল অনুরক্তের দল, কিন্তু ছিল না অন্তরঙ্গ। তপতীর মধ্যে অভিমন্যু কেবল যে বুদ্ধির দীপ্তি দেখেছিল তাই নয়, এই মেয়েটির ভয়হীন চালচলন এবং নির্বিকার সহনশীলতা লক্ষ্য ক'রে অভিমন্যু অনেক সময় বিস্ময় বোধ করেছে। নারীজনোচিত স্বাভাবিক আড়ষ্টতা তার ছিল না; আহারে বিহারে চলনে বচনে তা'র কেমন একটা পৌরুষ স্বভাব প্রকাশ পেতো। গ্রামে গিয়েছে সে ছেলেদের সঙ্গে কাজ করতে,—বারোয়ারিতলায় রাত কাটিয়ে দিল সে ছেলেদেরই মাঝখানে। নৌকার লগি ঠেলেছে, গরুর গাড়ী চালিয়েছে, মাথায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে গেছে সভাসমিতির আসবাবপত্র, এবং বন্যাস্রোতের মতো অনেক বাড়ীতে ঢুকে সে মেয়েদের টেনে এনেছে কাজে,—জেলে পাঠিয়েছে তাদের অনেককে। তপতী গৃহস্থসমাজে আতঙ্কের পাত্রী হয়ে উঠেছিল।

একদিন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসে সে অভিমন্যুকে ডাকলো। বললে, আমাকে একটা ওষুধ কিনে দিতে পারেন।

ওষুধ ?...তোমার ত কোনো অসুখ নেই ?

তপতী বললে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে একটা ওষুধ দেখলুম। খেলে নাকি বেশ রোগা হওয়া যায়!

হঠাৎ কি কথা মনে হয়ে তপতী যেন একটু লজ্জিত হোলো। নতমুখী স্বাস্থ্যবতীর দিকে তাকিয়ে অভিমন্যু বুঝতে পারলো, তার দেহের নিটোল পারিপাট্যই হয়তো তার সহজ চলাফেরার পক্ষে বাধা। অভিমন্যু বললে, ওষুধের দরকার হবে না। যেরকম অনিয়মে চলছো, তা'তে তোমার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। তবে হ্যাঁ—

তপতী মুখ তুলে তাকালো। হাসিমুখে অভিমন্যু বললে, গায়ের রংটা রোদে পুড়িয়ে বরং একটু ময়লা ক'রে নাও, তাতে কাজ হবে।

কি কাজ ?—তপতী নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলো।

এই ধরো, তুমি একটু দেখতে খারাপ হলে অত বেশী আর লোকের চোখে পড়বে না, পুলিশেও সহজে খুঁজে পাবে না!

আমার রং কি খুব ফর্সা ?

অভিমন্যু বললে, বাঃ বেশ তুমি! আমার মুখ দিয়ে বুঝি স্বীকার করিয়ে নিতে চাও ? অত সহজে আমি সুখ্যাতি করতে পারবো না।

তপতী বললে, যদি কাজের সুবিধে হয় আমি কালো হ'তে রাজি আছি।

তা হলে যা বলি শোনো। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত থাকো, সব্বাইকে রান্না ক'রে খাওয়াও, তাহলে কৃষ্ণাঙ্গী হ'তে পারবে। দেশের কাজও হবে অনেক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তপতী রান্না করতে গিয়ে বাস্তবিকই কালি ঝুলি মেখে অভিমন্যুর সামনে এসেছিল। তপতীর প্রতিজ্ঞা ছিল, কিন্তু পরিহাসবোধ ছিল না।

একতাল কাঁচা মাটী ছিল তপতী, অভিমন্যু তার থেকে পুতুল গ'ড়ে তুলেছিল। দেশসেবার নানা দুঃখ-দুর্দশার আগুনে সেই পুতুল পুড়ে শক্ত হোলো। অভিমন্যু তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলো আপন মন্ত্রে, রং ধরিয়ে দিল তা'র মর্মে মর্মে। পুতুল হয়ে উঠলো প্রতিমা।

কোনো যুগের কোনো কর্মনীতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। কর্মে ও চিন্তাধারায় অভিমন্যুর ধীরে ধীরে পরিবর্তন হ'তে লাগলো। যে-জনসমারোহটা ছিল তার আশে পাশে, সেটা যেন পশ্চিমের মেঘের রঙের মতো অল্পে অল্পে মিলিয়ে এলো। যুদ্ধ বাধলো ইউরোপে, কিন্তু তার চেয়েও বড় রকমের যুদ্ধ বেধে উঠলো অভিমন্যুর মনে। সেই যুদ্ধ পরস্পর বিরোধী আদর্শের,—বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কতকগুলি জটিল চিন্তাধারার। এতকাল ধ'রে সে যা ব'লে এলো, এ তা'র বিপরীত; যত কাজ সে ক'রে এলো, সবগুলো যেন অর্থহীন; যা দেখে এলো সবগুলোই দৃষ্টিবিভ্রম। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে অভিমন্যুর কত

দীর্ঘদিন কেটে গেছে একা, বিরক্তিতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তপতীকে সে কতদিন। একদিন সেই ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হোল বৈকি।

কিন্তু যে-মেয়েটিকে অভিমন্যু তা'র জীবনের একাগ্র ও একান্ত সাধনার দ্বারা তৈরী করেছে, তা'র মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। সে জানতো নিজেকে, জানতো আপন স্বভাবকে, সেইজন্য তার মনোবিকলনের কোনো হেতু ছিল না। তার পথ ছিল সোজা ও সহজ। দেশ মানে মাটি নয়, মানুষ। অধিকতম মানুষের জন্য অধিকতম কল্যাণের আয়োজন। সেই কল্যাণের গোড়ার কথা হোলো কর্মযোগ। তপতীর বুঝতে দেরী হয়নি আসল কাজের চেহারা; শিখতে তা'র দেরী হয়নি প্রকৃত কল্যাণের সারমর্ম। অভিমন্যু এতকাল ধ'রে জেনেছে বহু পথের সন্ধান,—সেই পথের গোলক-ধাঁধায় সে নিজেই পথ হারায়। তপতী জেনেছে একটিমাত্র পথ, সেই পথটিকে সে আপন প্রাণের দীপ্তিতে আলোকিত ক'রে রেখেছে। জীবনটা অত্যন্ত সরল, কোথাও এর কোন রহস্য নেই,—তপতী জেনেছে। প্রাণটা হোলো আদি-শক্তির উৎস, দেহটা হল কর্মযন্ত্র। প্রাণ পরিচালনা করে দেহকে,—এ সম্পর্কে তপতী নিঃসংশয়।

দুঃখ পেয়েছে তপতী অনেক। দেহের উপর উৎপীড়ন ঘটেছে তার চেয়েও বেশী। আঘাতে কাতর হয়নি, দুর্দশায় সহানুভূতি লাভ করেনি, সামাজিক ও শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর

কাছে সুখ্যাতিও পায়নি। বাইরে অপমানিত হয়েছে রাজশক্তির হাতে, কারাগারের ভিতরে লাঞ্ছিত হয়েছে মেট্রনের কাছে! কিন্তু তবু কোনোদিন তা'র নিরানন্দ ছিল না। একাজের পুরস্কার কি, তপতী সেটা বুঝে নিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল নিন্দা, গ্লানি, অপযশ, অনাদর—এরা হোলো আদর্শ সাধনার পথের একমাত্র পাথেয়। সেজন্য এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি। তা'র পথ ছিল সোজা, বুদ্ধি ছিল পরিচ্ছন্ন, অনুভূতি ছিল প্রখর, পরিকল্পনা ছিল অতি সুস্পষ্ট। সেই কারণে তপতী যত লাঞ্ছনা আর অসম্ভ্রম সহ্য করেছে, ততই দেখা দিয়েছে তার মুখে প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হাসি ততই প্রকাশ পেয়েছে তার স্বাস্থ্যের আনন্দময় উজ্জ্বলতা। তপতীর সমস্ত জীবন ভ'রে রয়ে গেছে অপরিসীম পরিতৃপ্তি। জীবনের কোনো অবস্থাতেই সে পরাজয় স্বীকার করেনি।

কিন্তু অভিমন্যু নিজে? সাফল্য আর সার্থকতার অগণ্য পথের হিসাব সে করেছে, কিন্তু কী আঁকাবাঁকা, কী জটিল। জীবনটা সহজ নয়, কেননা জীবনভরাই রহস্য। অনেক নির্বোধ হেসে যায়, অনেক অর্বাচীন জীবনটাকে হাল্‌কা ব'লে উড়িয়ে দেয়। হাসিটা হোলো জীবনের স্তোকসান্ত্বনা, দুঃখই হোলো জীবনের সব চেয়ে বড় পরিচয়। দুঃখের দুস্তর পথ ধ'রে অভিমন্যু এগিয়েছে। সে বিশ্বাস করে এর পরিণতি আছে, প্রতিকার আছে। সে বিশ্বাস

করে মানুষের দুঃখ আত্মিক নয়, অর্থনৈতিক। আলো সে খুঁজে পায়নি এখনও, কিন্তু সে জানে আঁধারাচ্ছন্ন অবস্থার ওপারে আলো আছে। সে বিশ্বাস করে একটা বিশেষ ব্যবস্থার চক্রান্তেই পৃথিবীজোড়া মানুষের এত দুঃসহ দুর্ভোগ। সেই ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাতে হবে, তাকে নির্মূল করার জন্য আনতে হবে সর্বব্যাপী বিপ্লব। সেই বিপ্লব বন্যার মতো আসবে, ভাসাবে সব, ধুয়ে নিয়ে যাবে যা কিছু মালিন্য, রেখে যাবে নতুন পলিমাটী। তার ক্ষমা নেই, অনুগ্রহ নেই, বিচারবিবেচনা নেই—দুর্দান্ত তাড়নায় তাকে আসতে হবে ছুটে; কেননা সেটাই ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সেটাই হোলো সভ্যতার ধারাবাহিকতা!

সাতদিন পরে তপতীর চিঠি এলো:

রাগ করো না, অভিমন্যু। কী পেলে সেটা বড় নয়, কী দিতে পারলে সেইটিই আসল কথা। দুঃখ লাঘবের ভার তোমার হাতে নয়, তোমাকে কেবল কাজ ক'রে যেতে হবে। সেই কাজের নির্দেশ আছে বৈ কি জীবনে। মানুষ কি সুধু চায় অন্ন, আশ্রয়, স্বাস্থ্য আর শিক্ষা? আর কিছু কি তা'র চাইবার নেই? পৃথিবীজোড়া এই যে নিরানন্দ, এ কি সুধু অন্নের অভাবে? মানুষের শক্তি কি সুধু স্বাস্থ্যশক্তি? মানুষকে বাঁচানো গেল, কিন্তু মনুষ্যত্ব

বাঁচলো না—সেই অবস্থা কি ভয়াবহ নয়? শিক্ষা না হয় দিলে, কিন্তু এই যে চারিদিকের সংস্কৃতি-সঙ্কট, এর থেকে উত্তীর্ণ হলে কি? পশুস্তর থেকে উঠে মানুষ একদিন সভ্যতা বিস্তারের কথা ভেবেছিল, সেটা কোন্ ব্যবস্থাপনাকে আশ্রয় ক'রে? সংহতির অর্থ তুমি কী বুঝেছ জানিনে, কিন্তু কিসের সংহতি? আত্মিক শক্তির? মনুষ্যত্বের? না, লক্ষ লক্ষ মেষপালের? যদি এমন ঘটে, চল্লিশ কোটি হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্লচিত্ত জানোয়ার আমাদের দেশে বাস করে, তবে তোমার আমার গৌরব বাড়ে কি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনটাকে দেখতে হবে,—এই সস্তা নীরস কথাটা তোমার মুখে বার বার শুনেছি। আর কোনো দৃষ্টিভঙ্গী কি তোমার জানা নেই? তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কৃপায় এটম্ বোমা পর্যন্ত এসে পৌছেছে। কিন্তু তারপর? জীবনটাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারলে কি? প্রাণের ক্ষুধা কি মিটলো? বিজ্ঞান কি এর জবাব দিতে পারছে? রাগ ক'রো না, অভিমন্যু। তোমাকে আর বুঝতে পারছিনে ব'লেই তোমার জবাবে আমার পিপাসা আর মিটছে না। তোমার চারিদিকের মানুষ দুঃখ পাচ্ছে অন্নবস্ত্রের অভাবে, তুমি তা'র প্রতিকারে মন দিয়েছ। তুমি বলছ, চল্‌তি ব্যবস্থাকে না বদলালে তাদের দুঃখ ঘুচবে না; সুতরাং বিপ্লব আনতে হবে। সে-বিপ্লব আমিও চাই, অভিমন্যু,—কিন্তু এত আক্রোশ জমিয়ে তুলতে চাও কেন? কেন

বিদ্বেষ এত ? তুমি কি বলতে চাও, মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড় সর্বব্যাপী বিপ্লব ? কেন বলতে চাও রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া মানব সমাজ অগ্রসর হয় না ? আমাদের দেশে কি একথা সত্যি হয়েছে কোনোদিন ? আমাদের দেশ চিরকাল ধ'রে চেয়েছে সংহতি, সংহার নয়। বিপ্লব চায়নি, চেয়েছে বিন্যাস। পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের সংগ্রাম, এই কি আমাদের ঐতিহ্য-ইতিহাস নয় ? রাবণ-দুর্যোধন-পাঠান-মোগল,—এবং এই সেদিনের ইংরেজ,—এদের শাসনের অবসান ঘটলো কেন ? এরা সংহতি চায়নি, চেয়েছিল সংহার। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে এরা পালায়নি,—এরা দূর হয়েছে নিজেদের দুষ্কৃতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। আজ আবার শুভ সুযোগ এসেছে তোমার আমার জীবনে,—একে অভ্যর্থনা করো, গ্রহণ করো। একে জয়ধ্বনি দাও, শঙ্খধ্বনি তোলো। যত বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন, বিক্ষিপ্ত, আর এলোমেলো হয়ে রয়েছে, সমস্ত মিলিয়ে সমন্বয় সাধন করো—সেই হবে তোমার আমার পুণ্যকর্ম। রাগ করো না, অভিমন্যু।

ইতি—তোমার বেদেনী।

বাইরের থেকে সাড়া এলো, অভিদা, আমি কি চ'লে যাবো ?

ওঃ—অভিমন্যুর চমক ভাঙলো,—তুমি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছ, না সুব্রত ?

সুব্রত ভিতরে এলো। চিঠিখানা একপাশে সরিয়ে রেখে অভিমন্যু বললে, ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে ?

সুব্রত বললে, হ্যাঁ, বেলা নটা থেকে। আমরা প্রসেসন্ বা'র করবো কি?

নিশ্চয়। অসন্তোষকে জাগিয়ে রাখা চাই। কোনও সময়ে নিজেরা থেমে যেয়ো না। ধর্মঘটীর সংখ্যা কত হবে?

তা প্রায় এগারো হাজার।

ঠিক আছে, যাও।—অভিমন্যুর মুখে দীপ্তি দেখা গেল।

লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশী দূরে নয়। একদিকে কয়েক ঘর হিন্দুস্থানী বস্‌তি,—সামনেই প্রান্তর, গম ভুট্টা আর জোয়ারের ক্ষেত পেরিয়ে রেলপথ চ'লে গেছে একেবারে সেই দিগন্তের দিকে। বস্‌তি পেরিয়ে উত্তর দিকে কিছুদূর এলেই গোমতী নদী। নদীর জল কমে-বাড়ে আপন খেয়াল-খুশিতে। তবে এখন হেমন্ত, জলের প্রবাহ স্বভাবতই কিছু স্তিমিত।

কাছেই জৈনী ঘাট, সে-ঘাট অনেককাল থেকে সুদৃশ্যভাবে বাঁধানো। ঘাট পেরিয়ে উঠে এলে প্রথমেই গোলাপবাগিচা। এখন হেমন্ত, গোলাপের সমারোহ কিছুকাল আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। বাগানে পাইন্, পপলার, ফার আর ইউ-ক্যালিপটসের প্রচুর সমারোহ; তার ফলে প্রভাত ও সন্ধ্যায় সূর্যরশ্মির অপূর্ব শোভা ঘটে। সুদীর্ঘ তরুশাখা ও পল্লবে বিচিত্র বর্ণপ্রবাহ দেখা যায়, এবং তার দীর্ঘ সুউচ্চ শোভায় অনুভব করা যায় কেমন একটা বিশালতা,—অনেকটা যেন পার্বত্য মহিমার মতো। নানা দেশ ও প্রান্তর থেকে আসে নানা জাতের পাখী,—সকাল সন্ধ্যায় তা'রা গাছ ভ'রে থাকে। এখন হেমন্ত, এই সময়ে এই পথ দিয়ে উড়ে যায় হিমালয়ের বনহংসের দল; উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশপথে তাদের গতি।

হিন্দুস্থানী পল্লীর যারা বাসিন্দা, তারা অধিকাংশই দেহাতী। অবশ্য লক্ষ্ণৌ শহরে আজকাল অনেক কাজ বেড়েছে, সুতরাং ওদের মধ্যে দুচারজন মজুর যে নেই তা নয়, তবে বেশীর ভাগই ক্ষেতখামার নিয়ে থাকে। তাদের অনেকেই টাট্‌কা শাকসব্জী বেচতে আসে এই গোলাপ-বাগিচার বাঙলোয়, এর বেশী এই উদ্যানবাটীর সম্পর্কে তাদের আর কোন উদ্বেগ নেই। এই বাঙলোর প্রকৃত নাম যে 'বেলাবন'— এ খবরও তা'রা এ পর্যন্ত জানে না।

এমন কি তপতীও নয়। তবে প্রথমে এখানে এসে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এ বাড়ীটী স্থাপত্যশিল্পের একটি মনোরম নিদর্শন। শোনা যায় বহুকাল আগে অযোধ্যার কোন্ পরমাসুন্দরী এক নবাবনন্দিনী এই বাড়ীটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর কোন্ রাজদ্রোহী প্রিয়তমের জন্য। তাঁর সেই প্রিয়তম এখানে বসবাস করেছিলেন কিনা সে ইতিহাস অজ্ঞাত; তবে কৌমার্যব্রতা সেই নবাবনন্দিনী এই ক্ষুদ্র প্রাসাদের অলিন্দে এক জ্যোৎস্নারাত্রে দাঁড়িয়ে নাকি বিষ-পাত্রে চুমুক দিয়েছিলেন। কিন্তু বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না হয়ে সেই নারী উন্মাদিনী হয়ে যান্। এই প্রাসাদে সেই উন্মাদিনীর অবশিষ্ট জীবন কাটে। অদূরে গোমতীর তটের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র সমাধি আজও চোখে পড়ে।

তপতী এই কাহিনীটি প্রথম শোনে কমলের কাছে। কমল কোথা থেকে যেন এ কাহিনী সংগ্রহ করেছিল অসীম

অধ্যবসায়ে। প্রথম দিন আলাপের পরেই তপতীর মুখের উপর সে প্রশ্ন ক'রে বসলো, আপনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন?

তপতী হাসিমুখে বললে, অনেক লোকের মাঝখানে থাকলে করিনে।

ছোকরা ডাক্তার কমল তা'র অকপট উক্তি শুনে একেবারে হেসেই অস্থির। বললে, তবে এখানে একলা থাকেন কি ক'রে? এ বাড়ী নিলেন কেন আপনি?

তপতী বললে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। আপাতত কিছুকাল এ বাগানে থাকতেই হবে, তারপর যদি শহরে একটু ঠাঁই মেলে।

কমল বললে, চমৎকার চাকরি আপনার। দায়িত্বও নেই, সময়ের বাঁধাবাঁধিও নেই। কিন্তু আপনার সাহস আছে বলতে হবে। সন্ধ্যার পরে এখান থেকে মাথা কুটোকুটি ক'রে চেঁচালেও কারো সাড়া পাবেন না। ও পাশে ময়দান, এ পাশে নদী। নদীর ওপারে আবার মাঠ। আমি ত' ভেবেই পাচ্ছিনে।

কমলের বয়স কম। সে এসেছে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে। শিয়ালকোটে সে মানুষ, এবং আজও সে দেখেনি বাঙলা দেশটা কেমন। প্রথম দিকে অতি সামান্যই বাঙলা কথা সে জানতো, কিন্তু তপতীর অশ্রান্ত চেষ্টায় কমল এতদিনে বাঙলা বিদ্যায় অনেকটা উন্নতি লাভ করেছে। লক্ষ্ণৌতে ছোটখাটো একটা বাঙালী সমাজ আছে বটে, কিন্তু তাদের

সঙ্গে কমলের কিছুমাত্র পরিচয় না থাকায় ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাচক্রে তপতীর সঙ্গে তা'র আলাপ হয়ে যায়। তপতীর লাভ হোলো একজন সঙ্গী, কমলের লাভ হোলো একটি সঙ্গ।

কালক্রমে সম্পর্কটা আন্তরিক হয়েছে তাই নয়, ওরা দুজনে সত্যিকার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ফলে, এই হয়েছে, চিকিৎসা বিদ্যাটা তপতী কতকটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। অন্যদিকে কমলের সুবিধা হোলো এই যে, তপতীর অনেকগুলি প্রিয় বই সে প'ড়ে নিয়েছে। সাহিত্য ও সমাজ-নীতির নানা-বিষয় কমলের অজানা ছিল, কিন্তু এখন অন্তত মোটামুটি আলোচনায় সে যোগ দিতে পারে।

গোমতীর ওপারে বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। গোলাপের বাগান পেরিয়ে পাইনের তলা দিয়ে দুজনে বাঁধানো ঘাটের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। অভিমন্যুর চিঠিখানা পেয়ে আজ তপতীর মনটা ভালো ছিল না। সে এক সময় বললে, আচ্ছা কমলকুমার, আমার কথার সঠিক জবাব দাও ত ?

কমল তা'র মুখের দিকে তাকালো। বললে, এতদিন কি তোমাকে বেঠিক ব'লে এসেছি ?

ঠিক ক'রে বলো, পুরুষের প্রিয় কি ?

কমল বললে, তোমার যা প্রিয় ঠিক তা'র উল্‌টো।

আবার তামাসা ?—তপতী চোখ পাকালো।

সত্যি বলছি। পুরুষের প্রিয় কি, পুরুষ হয়েও আমি

বলতে পারিনে। যা পাওয়া যায় না তার জন্যে সে ছোটে, যা চায় না তাই নিয়ে সে নেচে বেড়ায়।

তপতী বললে, ঘর সংসার?

কমল বললে, ওটা ত আদিম বৃত্তি!

সুখস্বাচ্ছন্দ্য?

ওটার ব্যাখ্যা সকলের কাছে সমান নয়!

তপতী বললে, আচ্ছা, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

কমল বললে, মানে?

ধরো, আমি ত' একটা মানুষ! দোষে-গুণে, ভালোয়-মন্দয়, আলোয়-ছায়ায়—

সব মিলিয়েই ত' তুমি!

জলের ধারে এসে দুজনে বসলো। শীতের বাতাসের সঙ্গে কেমন যেন রুক্ষ নীরস মাটির গন্ধ নাকে আসছে। গোধূলির মলিন আভাটা এসে পড়েছে তপতীর গায়ের উপর। তপতী চুপ ক'রে ছিল।

কমল বললে, বাজে কথা যাক্। কালকের সেই গল্পটা আজ তোমাকে শেষ করতেই হবে ব'লে রাখছি। আমার চেয়ে দুচার বছরের বড় হয়ে তুমি এতদিন অনেক অভিভাবকত্ব ফলিয়ে নিয়েছ, এবার কিন্তু আর বরদাস্ত করবো না।

তপতী বললে, কি করবে?

অন্তত পৌরুষের পরিচয় দিতে পারবো!

সে-পরিচয় কি প্রকার?

কমল বললে, মনে রেখো বাঙালীর রক্ত আমার ধমনীতে। আর কিছু না হোক, শূন্য আস্ফালনে আমি কারো চেয়ে কম যাবো না।

তপতী খুব এক চোট হেসে নিল। পরে বললে, গল্প ত' আব সত্যি নয়।

কিন্তু এমন কোন্ ব্যক্তি, যার জন্যে তুমি সব ছেড়ে দিলে?

তপতী বললে, মিথ্যে কথা, আমি কিছুই ছাড়িনি! আমার পরিচ্ছদের বিলাস তুমি জানো, আহারাদির ব্যাপারে আমি উদার, মোটর ছাড়া এখন আর চলিনে, নবাবনন্দিনীর প্রাসাদে থাকি, সবকারী চাকরী ক'রে মোটা মাইনে পাই। আমি ছেড়েছি কিছু?

কমল বললে, কিন্তু কোনোটাতেই যে তুমি লিপ্ত নও!

কেমন ক'রে জানলে?—তপতী তা'র দিকে তাকালো।

কেমন ক'রে জানলুম!—জানলুম তোমার হাতে আঁকা ছবি দেখে, তোমার গান শুনে, তোমার আন্‌মনা ভাব দেখে, তোমার কবিতা পাঠের ভিতর দিয়ে তোমার মনের আকুলতা লক্ষ্য ক'রে।—কমল বললে, বলো দেখি আমি কি ভুল করেছি?

তপতী হঠাৎ হাসলো। বললে, কমল, কুড়ি বছর বয়সে তোমার এই সার্টিফিকেট পেলে হয়ত মাথা ঘুরে যেতো, কিন্তু এখন আমার প্রায় তিরিশ। এই সব গুণপনা যদি আমার থেকে থাকে, তবে ত', কোনো ঘাটেই আমার জায়গা নেই!

বরং শিল্পে আর কাব্যে ঝোঁক না থেকে যদি আর একটু হিসাব বুদ্ধি থাকতো তবে সংসারে কোনো কোনো জায়গায় কল্‌কে পেতুম।

ফস ক'রে কমল বললে, তোমার মতন মেয়ে যেখানে কল্‌কে পায় না, সে-জায়গাকে আমি নরক মনে করি।

তপতী বললে, যার জায়গা ঘরেও নেই, ঘাটেও নেই—সে স্বর্গেরও অযোগ্য, কমল!

তপতী তা'র ছোট্ট নিশ্বাসটি চেপে চেপে ফেললো।

কমল বললে, তোমার জায়গা তোমারই সৃষ্টি, যেমন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের হাতে। জীবনটাকে নিয়ে ঘরকন্নার কষ্টিপাথরে তুমি ঘ'ষে হয়ত দেখোনি, কিন্তু আমি যদি শুনি তুমি আনন্দে বাস করছ, আমি তাতেই খুশী থাকবো।

তপতী বললে, আনন্দ কি আপেক্ষিক নয়, কমল?

দর্শন শাস্ত্র আমি বুঝিনে। আমি বুঝি উপাদান কিংবা উপলক্ষ্য। শোনো একটা গল্প। সবকাবি কমিশন্ নিয়ে একবার আমি গিয়েছিলুম পাঞ্জাবের পাহাড়ে। থাকতুম এক বাঙলোয়। তারই পাশে কোনো এক বস্‌তির থেকে একটি ছোট্ট মুসলমান বালক খেলা করতে আসতো। অতি রূপবান শিশু,—মাথায় থাকতো তা'র লাল টুপি। নিজের মনে খেল্‌তো আর গান গেয়ে বেড়াতো। আশে-পাশের কোনো দুঃখ ব্যথা নিরানন্দের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ

ছিল না। যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে আনন্দ পাওয়া যায় না,—আনন্দ কি আত্মবিস্মৃতির সমগোত্রীয় নয়? অনেক জ্ঞানী গুণী প্রবীণ সাংসারিক ব্যক্তিকে সদানন্দময় দেখা যায়, তা'র হেতু কি?

তপতী বললে, অসাড় এবং অচেতন মনের একপ্রকার খুশী দেখা যায়, তুমি কি তা'র কথা বলছ?

না,—কমল বললে, তা'রা মূঢ়। নির্বোধের নিত্য উল্লাস আমার দুচোখের বিষ। আমি বলছি সহজ সুরের কথা। সাধুভাষায় যাকে বলে, নির্লিপ্ত আত্মার স্বাভাবিক প্রফুল্ল প্রকাশ!

তপতী বিস্ফারিত চক্ষে তা'র দিকে তাকালো। পরে কৌতুকভরা কণ্ঠে বললে, কমল, এবার বাড়ী যাবে কি? সন্ধ্যা হয়ে এলো। তুমি বোধ হয় বুঝেই নিয়েছ যে, আমার ধর্মকর্মে মন দেবার সময় হয়েছে?

কমল হাসিমুখে বললে, তুমিই ত' তখন থেকে বাজে কথা তুলে আসল কথা চাপা দিতে চাইছ!

তপতী বললে, আসল কথাটা কি?

আসল কথা হোলো তোমার গল্প,—যেটা বলবার জন্য আমাকে ছ'মাস ধ'রে আশ্বাস দিয়ে রেখেছ?

বটে! তোমার এই কৌতূহলের রহস্য?

জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বাসনা!

পুরুষের জ্ঞান হয় কোনোকালে?

কমল বললে, পুরুষের প্রতি তোমার এই বিদ্রূপ কেন? পুরুষেব তপস্যাই ত' জ্ঞানের।

তপতী বললে, আমি কোনো গল্পই জানিনে, কমল।

তোমাব জীবনটাই ত' একটা গল্প, আমাকে তা'র স্বাদ গ্রহণ কবতে দেবে না কেন?

হাসিমুখে তপতী বললে, আমি নিজেই আজো তা'র কোনো স্বাদ পাইনি যে!

কমল বললে, তবে কি বলতে চাও তোমার জীবনেব সমস্তটাই ভুলভ্রান্তিতে ভবা?

হয়ত!

তোমার মন এত সচেতন, অথচ জীবনেব কোনো স্বাদ পাওনি,—তবে কি জীবনটা এতই ফিকে? এতই অর্থহীন? কোনো উপলক্ষ্য ধ'রেই কি তুমি কোনো আনন্দের ইন্দ্রজাল রচনা করোনি?

তপতী এবাব চুপ ক'রে বইলো। কমল যেন চাবিদিক থেকে জাল গুটিয়ে তা'কে ধ'রে ফেলতে চায়। কোনো একটা প্রশ্নেব সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া তা'র পক্ষে কঠিন, এইটিই আজ অবধি বোঝানো গেল না। তা'র মধ্যে আজো একটি নাবালক রয়ে গেছে, সে বড়ই অবাধ্য।

তা'র নীরবতা লক্ষ্য ক'রে কমল বললে, তোমাকে যখন ভাবিয়ে তুলতে পেরেছি তখন আর কিছু আমি

জানতে চাইবো না। তুমি বাস করো সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে, বাইরে তোমাকে কিছুই দেখা যায় না।

তপতী বললে, একটা কথা এতদিনে বুঝতে পারলুম।

সাগ্রহে কমল বললে, কি ?

ডাক্তারিতে তোমার কোনোদিনই পসার হবে না। শরীরতত্ত্ব অপেক্ষা মনস্তত্ত্বের দিকে এতবেশী ঝোঁক দিলে রুগী জোটে না, জানো ত ?

কমল এবার হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। বললে, মন জানলে শরীরকে জানা সহজ হয়। মনের বাহন হোলো শরীর। ডাক্তারীতে আমার পসার না হলে ক্ষতি নেই,—বাবার টাকা অনেক আছে ব্যাঙ্কে, কিন্তু তোমার কাছে বিশ্বাসী না হ'তে পারলে আমার সবই মিথ্যে।

তপতী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।—বুড়ো বয়সে এত বড় ভক্তর দেখা পেলুম, আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।—শোনো কমল, একটা কামনা রেখে যাবো এ জীবনে। পরের জন্মে যদি কখন বিয়ে করি, তবে তোমাকে যেন দেবর পাই। আসলটা ঠিকই থাকবে, কিন্তু সুদটা লাগবে মিষ্টি !

কমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, আমার কিন্তু কোনো কামনা নেই। আমি চাই কুঁড়ি ফুল হয়ে উঠুক, ফুল হয়ে উঠুক ফল।—সম্পর্ক আমি চাইনে তোমার সঙ্গে, আমি চাই তোমার সান্নিধ্য। দেখতে চাই তোমার বুদ্ধি,

তোমার সম্পূর্ণতা। কোথায় যেন জীবনটা তোমার পঙ্গু হয়ে রয়েছে, প্রকাশ তা'র বাধা পাচ্ছে। আমি চাই তার সর্বাঙ্গীন মুক্তি। এখানে তুমি রয়েছ, কিন্তু এ তোমার থাকা নয়,—এ নির্বাসন। তোমাকে মানায় একান্তে নয়, সকলের মাঝখানে! তোমাকে সকলে দেখুক, সেই আমার সকলের বড় আনন্দ।

তপতী বললে, সকলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে তুমি কি দেখতে পাবে? আমাকে এত বড় মনে করছ, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ পরিচয় কি তুমি জানো?

সমস্তটাই জানি।

তপতী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কি জানো?

কমল বললে, তোমাকে ভালো ক'রে দেখলে কি আর কিছু জানবার বাকি থাকে?

এ গুলো চাটুবাক্য, কমল!

তোমাকে চাটুবাক্য শুনিয়ে আমার লাভ?

কোনো একটা নিগূঢ় রকমের আত্মতৃপ্তি!

কমল হাসলো। বললে, দেবী ভারতীর বন্দনা করলে তিনি কি পূজারীকে এইভাবে তিরস্কার করেন?

তপতী কুণ্ঠিত লজ্জার সঙ্গে বললে, দেবী তাঁর পূজারীর অভিপ্রায় জানেন, মানবী তা'র ভক্তের অভিসন্ধি বোঝে কি? কিন্তু এবার তোমার যাবার সময় হয়েছে, ভাই।

তপতী এবার নিজেও উঠে দাঁড়ালো। কমলের মোটর

ছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে,—সে নিজেই গাড়ী চালায়। কয়েক পা এবার অগ্রসর হয়ে কমল বললে, সরস্বতীর আসনে তোমাকে অবশ্য বসালুম, কিন্তু আসলে তুমি দুষ্ট সরস্বতী!

কেন বলো ত?—তপতী জানতে চাইলো।

কমল বললে, এ পথ তুমি ছাড়ো দেখি?

কোন্ পথ?

ভুল পথ! তোমার কাজ পথ ভোলা নয়, ভোলানোও নয়, তোমার কাজ পথ দেখানো।

এক ঝলক হেসে তপতী বললে, তাহলে ডানদিকে ফিবে সোজা চ'লে যাও।

কমল এবাব খুব হাসলো, হেসে গাড়ী নিয়ে ছুটিয়ে চ'লে গেল।

—প্রতিজ্ঞার সাফল্য যদি না দেখি এ জীবনে, কোনো দুঃখ করবো না। আজো যারা এসে পৌঁছয়নি তা'রা তুলে নেবে আমার কাজ। কিন্তু আমার কাজ, এই বা কে বললে? এ কাজ কি তোমাদেব নয়? তিরিশ বছর ধ'রে তোমরা কি ব'লে এসেছো? লোভ কি দেখাওনি? ঐশ্বর্যের প্রলোভন কি সামনে তুলে ধরোনি? আজ তোমাদের সঙ্গে যাদের মত মিলছে না, পথ মিলছে না,—তাদের কপালে কলঙ্কের দাগ এঁকে দিয়ে বলছো তা'রা দেশেব শত্রু। অথচ এরাই ছিল

তোমাদের শক্তি, তোমাদের সংগ্রামের সৈনিক, এরাই ছিল তোমাদের সকল কর্মব্যবস্থার ভিত্তি। এরা মার খেয়ে এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক দশকে। এরা মার খেয়েছে বিপ্লবে, আন্দোলনে, দুর্ভিক্ষে, যুদ্ধে। এরা তোমাদের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়। এদের যৌবন এবং কর্মবুদ্ধিকে অসাড় ক'রে রাখার জন্য চল্লিশ বছর ধ'রে ইংরেজ একটির পর একটি দমন-আইন সযত্নে তৈরী করেছিল। কিন্তু সত্যিই কি এদের শৃঙ্খলিত ক'রে রাখা সম্ভব হয়েছিল? কত আশা, উদ্দীপনা, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মহৎ আদর্শ, কত গৌরবের আনন্দের ঐশ্বর্যের স্বপ্ন,—তোমাদের প্রত্যেকটি উপদেশ, বিবৃতি, প্রচার, কার্যতালিকা,—সমস্তগুলোর ভিতর থেকেই এরা আবিষ্কার করেছিল রাজরাজেশ্বরী দেশ-জননীকে। সেই বাষ্প আজ কোথায় উবে যাচ্ছে, নিজের মনের ভিতর তলিয়ে দেখেছ কি? চেয়ে দেখো যে-মধ্যবিত্ত সমাজ—দরিদ্র গৃহস্থ সমাজও বলতে পারো—যারা তোমাদের আদর্শ প্রচারের ফলে জীবনের সর্বস্ব পণ করেছিল,—যারা বন্দী হয়েছে, উৎপীড়ন সয়েছে, ফাঁসী গিয়েছে, মার খেয়ে জেলের মধ্যে মুখ বুজে মরেছে, যক্ষ্মারোগে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছে, অন্তরীণে নির্বাসনে নিরুদ্দেশে নিঃশেষে যাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে,—সত্য ত্যাগ অহিংসা প্রেম জাতীয়তার আদর্শ যাদের সামনে পবিত্র হোমাগ্নিশিখার মত উজ্জ্বলন্ত হয়েছিল,—তাদের সাধনার জোরেই কি তোমরা ক্ষমতালাভ করোনি?

তপতী জবাব দিল, অস্বীকার করিনে ত ?

আজ ক্ষমতালাভ ক'রে সেই তাদের মাথায় অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ নির্লজ্জের মতো !

কি রকম ?

উৎপীড়িত রাজবন্দীদের পরিবারকে ডেকে মাসিক মুষ্টিভিক্ষা আর এককালীন বকশিস দিতে তোমাদের হাত কাঁপে না ? নিজেদের কাছে মাথা হেঁট হয় না ? দেশের মুক্তির জন্য ছেলে ফাঁসী গিয়েছে, তা'র বিধবা মায়ের হাতে বকশিস তুলে দিচ্ছ, এ অপমান কি মুখ বুজে সইতে বলো ? তোমরা যারা জায়গা দখল ক'রে বসেছো, তোমরা কে ? কেউ আদরে লালিত মস্ত জমিদার, কেউ তা'র চেয়ে বড় ব্যবসায়ী, কেউ কায়েমী স্বার্থের দালাল,—কেউ বা··· আর বলবো ? সাপ্তাহিক কাগজের নোংরা ভাষায় আর ছুটো কথা কি শুনতে চাও ? ক্ষমতা লাভ করেছ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কাঁধে ভর দিয়ে। আজ তাদের অপমৃত্যু ঘটতে বসেছে, চোখ চেয়ে দেখছ কি ? নীচের তলাকার ভিত কাঁপছে, অগ্নিগিরির গর্ভে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, খবর কি পাচ্ছ না ? কাল যাদের বলেছিলে গণনারায়ণ, আজ তাদের বলছ, দেশের শত্রু। ধনীর ঘরে আজো উঠছে একটির পর একটি মোহরের ঘড়া, তোমরা নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছ,—কিন্তু গরীবরা যদি এই লুণ্ঠন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মারমুখী প্রতিবাদ তোলে, তবে কি সেটা এত বড় অন্যায় ?

তপতী জানালো, এই সস্তা চল্‌তি বুলিগুলো তুমি ত্যাগ করলে সুখী হই। যে-নীতি চ'লে এসেছে শত শত বছর ধ'রে—সুধু এদেশে নয়, বহুদেশে,—তা'কে সরাবার জন্য সময় দেবে না ?

বাঃ চমৎকার বুলি! এবার হয়ত শিশু-রাষ্ট্রের দোহাই দেবে! বলবে এ শিশুর মাত্র চার বছর বয়স, এর ওপরে এত জুলুম কেন ? কিন্তু শোনো, বেদেনী,—উঠন্তি মূলো পত্তনে চেনা যায়! তোমাদের রীত-প্রকৃতি যা প্রকাশ পাচ্ছে তা'তে ভরসা কম! ইংরেজ যাবার আগে যে-সমস্ত তোড়জোড় আল্‌গা ক'বে দিয়ে গেছে, সেইগুলোই তোমরা ক'সে এঁটে দিচ্ছ! মনে রেখো বিরুদ্ধবাদী শক্তি মাথা তুলে চারিদিক থেকে জড়ো হচ্ছে, তোমাদের পরে তাদের বিশ্বাস যাচ্ছে কমে। তোমরা ভালো কথা বলেছ, ভালো-বাসতে পারোনি। তোমরা ত্যাগের পথ দেখিয়েছ, অন্নবস্ত্র লাভের পথ দেখাওনি। রোগে দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছে, তোমরা তখন প্রচার করতে লেগেছ মনুষ্যত্বের কথা; শিক্ষাব অভাবে জীবন যখন পঙ্গু, তোমরা তখন আস্ফালন করছ ভোটের অধিকার নিয়ে। কিন্তু মনে বেখো, এদেশে ভয়াবহ দারিদ্র্য আর অপরিমেয় সম্পদ্ পাশাপাশি বাস করে, কোটি কোটি নরনারায়ণ কয়েকটি লোকের মুষ্টিভিক্ষার দাস,—এদের মধ্যেকার চির-কালীন বৈষম্য যদি দূর না হয়, তবে তোমাদের যে-শাসনতন্ত্রই

হোক, সে-গণতন্ত্র হবে ধনতন্ত্রেরই পরিপোষক। সুতরাং বিপ্লব একদিন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে।

তপতী জবাব দিল, তোমার বিপ্লবের সঠিক চেহারাটা আমি বুঝতে পারিনি। এ দেশে গান্ধীবাদ কি সর্বব্যাপী বিপ্লব আনেনি?

মাথা নত ক'রে মেনে নিলুম, বেদেনী। একদিন সূর্যের আলো সমান তেজে পড়েছিল সর্বত্র। আইনজ্ঞ নেতা, ব্যবসায়ী ও ধনী মহল গান্ধীবাদকে মেনে নিয়েছিল ক্ষমতা ও স্বার্থলাভের আশ্বাসে, আর কোটি কোটি দরিদ্ররা গান্ধীবাদকে মেনে নিয়েছিল দারিদ্র্য, অপমান আর উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। একথা কখনো শুনেছ, গান্ধীবাদী খদ্দরধারী কোনো কোটিপতি দেশসেবার অপরাধে কারাবরণ করেছে? উচ্চবিত্ত সমাজের লোকেরা একজোটে ইংরেজকে চটিয়েছে, শুনেছ কখনো? ভেবে দেখো চাষা আর মজুরদের সঙ্গে ইংরেজের কোনো কালে লড়াই হয়নি, হয়েছে উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ আর আইনজীবীদের সঙ্গে। যুক্তি ছিল ইংরেজের আইন, আর অস্ত্র ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণ। সেই যুদ্ধের ফলাফলের দিকে চেয়েছিল নীচের তলাকার লোক,— তিরিশ বছর ধ'রে যাদেরকে আমরা আশ্বাস দিয়ে এসেছি। তোমরা প্রথম সামান্য ক্ষমতা পেলে বছর চোদ্দ আগে, যেদিন তোমরা মন্ত্রী হ'লে। কিন্তু মন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নামে চৌর্যবৃত্তির বদনাম রটলো। সাহেবেরা চুরি করতো না,

রক্তশোষণ করতো,—সেই কারণে সহসা তা'রা ধরা পড়তো না। তাদের দস্যুবৃত্তির একটা নীতি ছিল, নিয়মানুগত্য ছিল, —তাদের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর ও প্রবল, আর দুর্বুদ্ধি ছিল অতি গভীর। তোমাদের আছে কোনোটা? বছর পনেরো আগে ইংরেজ আমলের এদেশী মন্ত্রীরা ভিতরে ভিতরে ঘুষ খেয়ে ধরা পড়েছে, এ খবর কখনো শুনেছ? আজ গান্ধী-বাদী মন্ত্রীদের অনেকেই অনেক প্রদেশে দুর্নীতির অভিযোগে নিন্দিত হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না কি? আজ প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে কয়জন মন্ত্রী, তোমাদের কয়জন দলপতি?

বেদেনী চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্ন করলো, তুমি এর কি কারণ খুঁজে পেয়েছ শুনি?

অকপটে বলতে পারি যদি অভয় দাও। সেই অর্ধনগ্ন ফকির তোমাদের বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু তার আদর্শে তোমাদের আস্থা ছিল না। তোমরা তাঁ'র বশ্যতা স্বীকার করেছিলে, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করেছিলে কয়জন? স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম দুর্নীতির কথা রটে তোমাদের নামে, অস্বীকার করতে পারো? সেদিন তোমরা বলেছিলে কিষাণ-মজদুর-প্রজাদের ডেকে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। স্বরাজের নমুনা দেখছি, এর পর রামরাজ্যটায় হয়ত বানর ছাড়া আর কারো জায়গা থাকবে না। যাদের নিয়ে আজ শাসন-তন্ত্র রচনা করতে বসেছ, তাদের সঙ্গে কিষাণ-মজদুর-প্রজার সম্পর্ক কতটুকু? তোমাদের ব্যবস্থা তা'রা ভবিষ্যতে মানবে

কি ? তাদের জুতোয় কোথায় কাঁটা ফোটে তোমরা কি খবর রাখো ? ইংরেজী জানা সভ্য আর ভদ্র সমাজের কয়েকটি প্রতিনিধি ব'সে গেছে ত্রিশ কোটি দরিদ্র চাষী মজুরের কল্যাণ-কৌশল উদ্‌ভাবনে ! হাস্যকর নয় কি ? তাদের কথা তোমরা বলছ,—কিন্তু তারা' বলছে কি ? তাদের কথা শুন্‌ছ তোমাদের ভাড়াটে প্রতিনিধির মুখ দিয়ে, কিন্তু তাদের কথা শুনতে হ'লে মাঠের মাটিতে কান পেতে থাকতে হয়, এই সাধারণ জ্ঞান তোমাদের আছে কি ? গণদেবতা জগন্নাথের পূজাব উপচার সাজিয়েছ মূল্যবান্‌ খাদ্যে, কিন্তু তাঁ'র হাত দুখানা কেটে নিয়েছ যে ! ফলে, খাদ্য উঠবেনা তাঁর মুখে, তোমরাই লুট ক'রে নেবে সব। কি ভাগ্যি দারুব্রহ্ম নারায়ণ কথা বলেন না—যদি বলেন কখনো, সেইদিন তোমাদের সবচেয়ে বিপদ।

বেদেনি, ভুল বুঝোনা আমাকে। অশান্তিতে ভ'রে গেছে ঘর, পল্লী, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, এমন কি পৃথিবী,—কিন্তু তোমার মতো আমিও চাই শান্তি। অথচ কোথা শান্তি ? শান্তির উপকরণই বা কই ? জীবনেব দিকে চেয়ে দেখো, ক্ষুধাতুর, রোগাতুর, ব্যথাতুর। প্রাণেব দিকে তাকাও,—শঙ্কা, অবিশ্বাস, সংশয় ! প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাও,—তিনশো বছরের লুণ্ঠনের পর কোটি কোটি ক্ষুধাজর্জ্জর হতভাগ্যের রক্তরাঙা চোখ ; প্রতীচ্যেব দিকে চোখ ফেরাও,—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার ও হিংসার প্রতিযোগিতা। এই দুইয়ের মাঝখানে তুমি আর আমি।

ইতি—তোমার সর্বনাশা

সেই অভিমন্যু! নরম দুটি দীর্ঘায়ত চোখ, সেই চোখে কখনো মালিন্যের ছায়া পড়েনি। কোনোদিন সাজসজ্জার পারিপাট্য প্রকাশ পায়নি। পরণে পরিচ্ছন্ন খদ্দরের পাঞ্জাবি,—তা'র বোতাম শেলাই ক'রে দিয়েছে তপতী কতদিন। পায়ে থাকতো শাদা নাগরা,—মানিয়ে যেতো পা দুখানার রঙের সঙ্গে। পুলিশ একদিন 'মৃদু'লাঠি চালনা ক'রে মেয়েদের মিছিল ভেঙ্গে দিয়েছিল, তপতী সেই ঘটনায় কপালে আঘাত পায়। অভিমন্যু তা'র নধর বলিষ্ঠ সুন্দর আঙ্গুল দিয়ে যখন তপতীর ক্ষতস্থানটি বেঁধে দিয়েছিল,—সেই স্পর্শ কী রোমাঞ্চকর, কী মধুর যন্ত্রণাময়, তপতী সে-কথা ভুলতে পারেনি। সেই প্রথম ছোঁয়া,—যেন সেই প্রথম সোনার কাঠির স্পর্শ। মনে পড়ে খর বৈশাখের একটি রৌদ্রদগ্ধ দিন। সকাল থেকে সভা, স্বেচ্ছাসেবক আর সোরগোল। সারাদিনমানব্যাপী বন্যপশুর মতো দুজনের অশ্রান্ত পরিশ্রম,—আহার জোটেনি কোনো সময়ে। অপরাহ্নের দিকে বুঝতে পারা গেল, শ'পাঁচেক টাকা যদি এখনই না পাওয়া যায় তবে আগামী কাল সকালে লজ্জার আর শেষ থাকবেনা। তপতী একখানা মোটর জোগাড় ক'রে এনে বললে, চলুন হুগলীতে, আমার এক বন্ধুর কাছে টাকা পেতে পারি।

ঘর্মাক্ত শ্রান্ত অভিমন্যু চটুল হাসি হেসে বললে, বন্ধু আবার কবে জুটলো?

ভয় নেই, সে আমার সহপাঠিনী ! চলুন দেখি।

বাঁচলুম !—হাসিমুখে অভিমন্যু গাড়ীতে উঠলো।

যাতায়াতে হয়ত মাইল পঞ্চাশেক পথ। তপতী নিজেই মোটর চালাচ্ছিল, বাঁ দিকে বসে রয়েছে অভিমন্যু,—বাঙলার তরুণ সমাজের নেতা। গ্রামের পথ ধ'রে মন্থর গতিতে মোটর চলেছে দিনান্তের রক্তিম আভার ভিতর দিয়ে। গাছে গাছে তখন সন্ধ্যার পাখীব কাকলী।

তপতীব উদ্‌গ্রীব চোখ রয়েছে পথের দিকে। একস্থলে দুই দিকেব অন্ধকার বনময় গ্রাম জনহীন মনে হচ্ছে। তপতী একসময় বললে, কলকাতার এত কাছে 'এমন জঙ্গল? বাঘ নেই ত?

অভিমন্যু বললে, আছে, সাবধান !

আছে !—তপতী দ্রুত গাড়ী চালালো।—বললে, যদি গাড়ীতে লাফিয়ে ওঠে ?

মধুর হাস্যে অভিমন্যু বললে, গাড়ীতে সে ব'সেই আছে !

কণ্ঠে কী নিবিড়তা অভিমন্যুর,—মধুরের ধ্যানরসে যেন তন্দ্রাতুর। পলকের জন্য তপতীর হাতের ষ্টিয়ারিং যেন শিথিল হয়ে এসেছিল। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে আপনি না অহিংসায় বিশ্বাসী ?

অভিমন্যু বললে, শাক্তের অহিংসা ?

আপনি মানেন না ?

মানি, বিশ্বাস করিনে।

তবে কাজ করবেন কেমন ক'রে? লোককে অনুপ্রাণিত করবেন কি দিয়ে? এ আপনি কি বলছেন?

তপতীর অধীর উদ্বেগ লক্ষ্য ক'রে অভিমন্যু বললে, সামান্য কথা। অহিংসাকে কোনোকালেই বাঙালী ধর্ম ব'লে স্বীকার করেনি, ভবিষ্যতেও করবে কিনা সন্দেহ। আজকের দিনে অহিংসাটা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা যায়, তাই ওটা মেনে নিয়েছি। এটা হোলো হাতিয়ার, এটাকে শান দিয়ে ধারালো করা যায়, বাঁকানো যায়, মচকানো যায়, যে কোনো সময়ে এটাকে খোলসের মতো খুলে ফেলা যায়,—তাই এটাকে বাঙালী মেনে নিয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে নয়, চুক্তি দিয়ে নয়,—সাময়িক কালের নীতি ব'লে মেনেছে। ভগবান বুদ্ধদেব আসন লাভ করেছেন সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্তু সেই মহাপুরুষের ঠাঁই হয়নি তাঁর নিজের দেশ এই বাঙলায়।

তপতী বললে, কই আপনি একথা আগে ত' বলেননি?

প্রয়োজন ঘটেনি, কেননা এটাই বাঙালীর ঐতিহ্যের ইতিহাস। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন সমগ্র শৈব ভারতবর্ষ অহিংসার পরীক্ষায় লিপ্ত, তখন শাক্ত-বুদ্ধি বাঙালী ইংরেজের রক্ত দুই হাতে মেখে আনন্দ পেয়েছে। রক্তের বদলে রক্ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ,—এ হোলো বাঙালীর মজ্জাগত। এখানে মেয়েরা পরে লালপেড়ে শাড়ী, কপালে সিন্দুর, পায়ে আলতা,—পুরুষের প্রিয় হোলো রক্তচন্দন, রক্তাম্বর, ছাগবলি। বাঙালী

ইংরেজকে প্রথম ভালো বেসেছিল রাজসিক জাতিহিসেবে; ইংরেজ বাঙালীকে প্রথম শাস্তি দেয় রাজসিক বুদ্ধির জন্যে। রক্তস্বভাব তান্ত্রিক বাঙালী চিরদিন রাজদ্রোহী। বাঙলা শান্ত থাকলে সমস্ত ভারত শান্ত; বাঙলায় বিপ্লব দেখা দিলে সারা ভারত কেঁপে ওঠে।

ফিরবার পথে অভিমন্যুর কী ক্লান্তি, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন তা'র দেহ একসময় তপতীর কাঁধের কাছে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে হেলে পড়ে। বিপন্ন তপতী গাড়ীর হেডলাইট্ জ্বেলে গতি বাড়িয়ে দেয়। চোখ বুজে একসময় জড়িতকণ্ঠে অভিমন্যু বলে, যদি এমনি ক'রে দুজনে যেতে পারতুম!

তপতী প্রশ্ন করে, কোথায়? বলুন না, কোথায়?

অভিমন্যু সাড়া দেয়না, কিন্তু মাঝপথে কালবৈশাখীর কালো আকাশ সিংহের গর্জনে ডেকে ওঠে। অভিমন্যু বলে, দুরন্ত···দুর্বার গতি! বাধা নেই—পিছনে চাওয়া নেই··· দুজনে···পথ ফুরোবেনা কোনোদিন···

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। মোটরের সামনের কাঁচ ঘোলাটে হয়ে এলো। তপতী স্পীড্ কমিয়ে দিল। কিন্তু অভিমন্যুর ঘুমের কী নিবিড় নেশা! দেশ, জাতি, সমাজ—কা'র জন্যে অভিমন্যুর এই পরিশ্রম? সুখে থাকতে পারতো অভিমন্যু! পৈতৃক সম্পদ্ ছিল তা'র প্রচুর, ছিল শিক্ষা, ছিল যৌবনশ্রী। কিন্তু দেশমুক্তির জন্য

জীবনের এই অপচয়,—এর মূল্য কি কোনোদিন থেকে যাবে সংগ্রামের ইতিহাসে?

কালবৈশাখীর প্রবল বারিধারার মধ্যে তপতী বাধ্য হয়ে গাড়ী থামালো। ভিতর ও বাহিরের আলো নিবিয়ে দিল।

বেলাবনের বাংলোয় এই নির্জন কক্ষে আলো জ্বেলে ব'সে তপতীর মনে পড়ছে, নিদ্রালু অভিমন্যুর সেই উত্তপ্ত নিশ্বাস তা'র কাঁধের ওপর। বিপ্লবীর অগ্নিশ্বাসে তা'র বাঁ দিকের শরীর যেন মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে,—সেই অগ্নি যেন ক্রমশঃ সঞ্চারিত হচ্ছে তা'র সকল দেহে, মনে, জীবনে, তা'র অন্তস্তন্ত্রের সকল গ্রন্থিতে। ছোট্ট একটি গাড়ীর মধ্যে প্রাণলোকের কি বিপ্লব সেদিন। আর সেই গাড়ীর বাইরে ঘোরান্ধকার প্রকৃতির কি তাণ্ডব বিদ্রোহ!

বেশ মনে পড়ে এক সময়ে কম্পিত কণ্ঠে তপতী ডাকলো, শুনছেন?

অভিমন্যু জবাব দিল, আর কতদূর?

এখনো অনেক দূর! অনেক—দূর।

অভিমন্যু ভারী নিশ্বাস ফেলে বললে, চলো।

তপতী বললে, বড্ড যে অন্ধকার,—এবার আপনি চালান্।

অভিমন্যু সোজা হয়ে বসলো। গা ঝাড়া দিয়ে বললে, আমি? আচ্ছা বেশ, আমিই চালাচ্ছি!

কিন্তু যদি আপনার হাত কাঁপে?

কাঁপুক। ভয়ে বুক না কাঁপলেই হোলো।

অভিমন্যু স'রে এসে ষ্টিয়ারিং ধ'রে আবার স্টার্ট দিল।

ঝমঝম ক'রে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু সে-রাত্রির সেই বৃষ্টি কী সুখের, কী আনন্দের, কী অপরিসীম আকুলতার! সে-পথ সে-রাত্রে অত শীঘ্র কেন ফুরিয়ে গেল! যদি তপতী সেই গাড়ীর চাকার তলায় তা'র তৃষাতুর বুক পেতে দিতে পারতো!

অভিমন্যু গাড়ী ছুটিয়েছিল তীব্র বেগে। উৎসুক উন্মুখ তপতী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো দুটি মধুর কথা শোনবার কামনায়।

মধুর কী কথা!—তপতী সেদিনও বোঝেনি, আজও না। সে কি তবে ফেরাতে চেয়েছিল অভিমন্যুকে সেই পথ থেকে? হয়ত ফেরালে ভালো হোতো, হয়ত অসন্তোষের এই সর্বনাশা বারুদ এমন ক'রে অভিমন্যুর মনে জমতো না। আজ সে স্বীকার করে না রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম,—স্বীকার করে না মানুষের আবেগ-প্রবণতা। চারিপাশের মানুষের দুঃখ, উৎপীড়ন, বেদনা, দারিদ্র্য, জীবনের অপচয়,—এই সব তা'র কাছে সত্য। সে চায় সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব, সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে হিংস্র অভিযান। তপতী তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতো, কিন্তু কোথায়? তা'র সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কী উপকরণ যোগাতো সে? স্নেহ, মোহ, দেহ, গেহ,—কোনোটাতেই তা'র মন তৃপ্ত নয়, লিপ্ত নয়। সমগ্র দেশের মাঝখানে সে যেন

একখানা তরবারির মতো উদ্ধত, উন্নত,—তা'র ধারালো ফলার ঝলকে চক্ষে ধাঁধাঁ লাগে।

অভিমন্যু বলতো, জীবনটা হোলো একটা বিজ্ঞান। একে নিয়ে পরীক্ষা চলছে অবিশ্রান্ত। এটা নানা রসের একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ। একে নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করো,—এর প্রকাশ কত রকমের। এর মধ্যে আছে বারুদ, বিস্ফোরক, আছে অগ্নিগিরির লাভা, আছে ফল্গুর ধারা, আছে কত আশ্চর্য আবিষ্কার। এক জারক রস মিলিয়ে দেখো এর মধ্যে বজ্রের কঠোরতা, অন্য রস মিশিয়ে দেখে নাও কুসুমের কোমলতা।

মনে পড়ছে পূর্ববঙ্গের একটি ছোট শহরে রাজনীতিক সম্মেলনে গিয়েছিল তা'রা দুজনে প্রতিনিধি হয়ে। সেটা শরতের শেষ প্রান্ত,—বোধ হয় শুক্লপক্ষেরও শেষ। ফিরবার পথে অপরাহ্নের দিকে ষ্টীমারে ওঠা, ভোরের দিকে এসে নামা গোয়ালন্দে। সমস্ত রাত্রি ভ'রে ছিল ষ্টীমারের দোলা,—আর দুদিকের দুকূল আকুল-করা জল। নানা জেলার প্রতিনিধি নানাবিধ আলোচনা সেরে এক সময় আহারাদি ক'রে যে-যার ক্যাবিনে উঠলেন। মেয়ের দলে তপতীর প্রভাব ছিল কম নয়। তাকে থাকতে হোলো নানা বিতর্কের মধ্যে। স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহের নবতন পদ্ধতি নিয়ে বহু জল্পনা চললো অনেক রাত পর্যন্ত।

কোনো একটি মেয়ে গান ধরেছিল, কিন্তু সে গানটি সমস্ত চেতনা দিয়ে শুনতে গেলে নিভৃত নির্জনতার দরকার। মাথাটা

ধ'রে উঠেছে ! তপতী বাইরে এলো ক্যাবিনের পিছন দিকে খোলা ছাদে। সেটা যেন হঠাৎ মুক্তি। মাথার উপরে সমস্ত শান্ত স্নিগ্ধ আকাশটার বন্ধন যেন খুলে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন মেঘনার আকাশ নক্ষত্রময়, চারিদিকে চন্দ্রোচ্ছ্বসিত বাঙলা দেশ,—দূরে ধূসর অস্পষ্ট দিগন্ত রেখা। নীচে চলন্ত ষ্টীমারের দুই পাশে চাকার তাড়নায় জলের ঝাপটের শব্দ শোনা যায়।

আনন্দে, মধুতে, কান্নায়, বেদনায় কেন তপতীর গলা অবধি ভ'রে ওঠে ? অনন্ত অগাধ জলে সে ভেসে চলেছে,—কেন তবে এই বুকভরা শুষ্কতা ? এত সমারোহ এত জনতা চারিদিকে,—তবে কেন এত শূন্য ! যে-কাজে সে উৎসর্গীকৃত, সেখানে কোথাও নেই ধন্যবাদ, নেই প্রীতি, নেই স্নেহ ! সামনে বিরাট মরুভূমি, পিছনে বিশালতর তৃষ্ণার লোল শুষ্ক জিহ্বা ! রাজশক্তির করাল দৃষ্টি, অতিকায় জন্তুর মতো কারা-তোরণের মুখব্যাদান, আত্মীয় স্বজনের অনাদর, বন্ধুগণের অবহেলা, হিতৈষীদের শাসন,—এপাশ ওপাশ থেকে কড়া উপদেশ। এই কি আদর্শের পথের একমাত্র পাথেয় ? তপতীর সংশয়াচ্ছন্ন চক্ষু জ্বালা ক'রে এক সময় জল এলো। ষ্টীমারের অলিন্দপথের রেলিংয়ে মাথা হেলিয়ে জলের দিকে সে চেয়ে রইলো।

সহসা লক্ষ্য করলো দূর থেকে সেই জলরাশির উপর দিয়ে বিশাল এক ছায়া তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে-ছায়া

দানবের, সে-ছায়া যেন নিয়তির। আত্মবিস্মৃত তপতী তাকালো বড় বড় চোখে। স্টীমারে আর কেউ জেগে নেই, খালাসীরা চ'লে গেছে নীচের তলায়, ক্যাবিনের আলোগুলি নিবে গেছে, —কেমন একটা আকস্মিক আতঙ্কে তপতীর ক্লান্ত দেহ হিম হয়ে এলো। জ্যোৎস্না উদ্‌ভাসিত পাটাতনের মসৃণ মেঝের উপর তা'র হতচেতন শিথিল তনুলতা হয়ত এখনই পুষ্প-স্তবকের মতো ঝ'রে পড়বে। তপতীর কম্পিত চোখ বন্ধ হয়ে এলো। অলস অনবলম্ব হাত দুখানা আব যেন আশ্রয় খুঁজে পেলো না।

একটি মুহূর্ত শুধু, তারপর ধীরে ধীরে মানুষের সঞ্চার হোলো তাব পিঠের ঠিক পাশে। কেমন একটা ঘন উষ্ণ সান্নিধ্যের মৃদু সঞ্চার। তপতীর চেতনা ফিরে এলো ধমনীর রক্তের প্রবাহে। সে ফিরে তাকালো! সামনেই দীর্ঘ ঋজু শান্ত অভিমন্যু।

তপতী বললে, আপনি! আপনার ছায়া পড়েছিল জলে, ভয় পেয়েছিলুম। এত রাত্রে আপনি জেগে?

অভিমন্যু বললে, তোমার চোখেও ঘুম নেই জানতে পারলুম।

কে জানালো?

হাসি মুখে অভিমন্যু বললে, শুক্লপক্ষের ভরানদীর কল্লোল!

সভয়ে তপতী এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, আপনার

নিন্দে রটলে আমার কিন্তু সইবে না। আপনি যান্—শুয়ে পড়ুন।

তপতী নিজেই চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো। অভিমন্যু বললে, থাক্, আমি যাচ্ছি।

মুখ ফিরিয়ে তপতী বললে, কী বলতে এসেছিলেন ?

কিছু না, এমনি। এই পায়চারি করছিলুম।—অভিমন্যু চ'লে যাচ্ছিল।

দু পা এগিয়ে তপতী বললে, শুনুন—?

কণ্ঠ যেন তা'র কান্নায় ভরা। সহসা সে ঝরঝরিয়ে বললে, আর কতদিন দেবী ? কতদিন থাকবো অপেক্ষায় ?

অভিমন্যু সবিস্ময়ে বললে, কিসের অপেক্ষায় ?

আহত পক্ষীর মতো আতুর কণ্ঠে তপতী পুনরায় অধীর প্রশ্ন করলো, কবে দেশ স্বাধীন হবে ?

শান্ত সংযত কণ্ঠে অভিমন্যু বললে, হবেই একদিন ?

তারপর আমাদের আর কী কাজ বাকি থাকবে ? কী নিয়ে কাটবে আমাদের দিন ? সেদিনও কি ছুটি পাবো না ?

অভিমন্যু তা'র সামনে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তারপর কোনো কথা না ব'লে চ'লে গেল নিজের ক্যাবিনের দিকে।

অসম্বৃত অশ্রু আর বাধা মানলো না, তপতীর দুই চোখ বেয়ে নেমে এলো দুই ধারায়।

*

* *

স্মৃতির পটে অসংখ্য ঘটনার ছবি। ছড়ানো চিঠিপত্রের মাঝখানে ব'সে তপতীর ক্লান্তি এসেছিল। সেদিনের জীবনের জাল ছোট ছোট ঘটনায় বোনা হয়েছিল সন্দেহ নেই। আজ সেই সব ঘটনা-পরম্পরা একটা পরিণতি লাভ করেছে বৈ কি। সে-পরিণতি যেমনই হোক। ক্ষেদ নেই তা'র জন্য, ক্ষোভ নেই কিছু। চিঠিগুলো আজ প'ড়ে রয়েছে প্রাণহীন ঝরাপাতার মতো, যৌবনোত্তর উত্তরে হাওয়ায় ওদের অন্তর্গূঢ় রস গেছে শুকিয়ে। কাছের কিছু আর দেখা যায়না, এখন দৃষ্টি হোলো দূরের। চোখের জলেরও একটা বয়স আছে, কোনো এক সময়ে সেই জল যায় শুকিয়ে। এককালে যে আকুল প্রশ্নটা জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা পায়, অন্যকালে সেই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন ছেলেমানুষী। কমলকে যদি সত্যকার মনের কথাটা বলা যেতো, কমলও হাসতো ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু কমল শুনতে চায় গল্প—যেটা ঘোরালো, যেটার পরিপূর্ণ সমগ্রতা আছে।

জনশূন্য বেলাবন বাইরের অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে। অদূর গোমতীর পার থেকে মাঝে মাঝে বনচর কোনো অনামা পাখীর অপরিচিত স্বর শোনা যাচ্ছে। খানসামা আছে কোনো এক ঘরের কোণে, দাই আছে হয়ত বাইরের বারান্দায়। সে হোলো তপতী,—জাতিগোত্র-পরিচয়-হীন, —যেন কোন একটা যূথভ্রষ্ট গাছ শূন্য মাঠের মাঝখানে।

মাটির মূল আঁকড়ে তাকে থাকতেই হবে। ঝড়ে, জলে, শীতে রৌদ্রে কোনো বৈলক্ষণ্য হ'লে চলবে না। বসন্তে দু' একটি কিশলয়,—কিন্তু না ফুল, না ফল।

হঠাৎ চমকে উঠলো তপতী পায়ের শব্দে। দাই যেন একটু ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ডাকলো, বাঈ?

তপতী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। দাই বললে, বাবু ফিন্ আয়া—

তপতী প্রশ্ন করলো, কৌন্ বাবু?

দাই একটু থতিয়ে গেল। যদিও ক্লান্তি, ঈষৎ বিরক্তিও তবুও সহাস্যে তপতী উঠে এলো। কমলের মনে আবার কি নতুন প্রশ্নের ধুয়ো উঠেছে? ওর পাগলামির কি শেষ নেই? দরজার কাছাকাছি এসে বারান্দার স্তিমিত আলোয় মুখ তুলে সে ডাকলো, আবার কেন হে কমলবাবু?

দাই একটু চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, ডাংদার সাব নেহিন্ হ্যায়—

তবে?

যে-ব্যক্তি গম্ভীরভাবে এগিয়ে এলো সে কমল নয়, আর একজন। তপতী চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। অভিমন্যু সামনে এসে দাঁড়ালো! সেই সুদীর্ঘ দেহযষ্টি,—কাঠিন্যে গম্ভীর, আত্মসমাহিত।

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ দাই না দেখতে পায়, বুঝতে না পারে নাটকীয় হতবুদ্ধির ভাব। চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলে

চলবে না, উদ্বেল-আকুলতার কোনো চিহ্ন ধরা না পড়ে। তপতী কেবল ছোট্ট ক'রে বললে, আসুন। কোন্ গাড়ীতে এলেন?

আভূমি নত হয়ে সে অভিমন্যুর পায়ের ধুলো নিতে চেষ্টা করলো—কিন্তু পায়ের আঙ্গুল ছুঁতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। তারপর মাথা তুলে সে বললে, দাই, কাম্‌রা খোল্ দেও,—গোসলখানামে পানি দেও।

খানসামা এসে দাঁড়িয়েছিল। তা'র দিকে চেয়ে তপতী পুনরায় বললে, খানা বনানা—

নবাগত অতিথিকে নমস্কার জানিয়ে খানসামা খুশী হয়ে চ'লে গেল,—দাই গেল তা'র কাজে। এ তাদের কাছে নতুন নয়। সরকারি লোক মধ্যে মাঝে এমন আসে! আসে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই। বাঈজী তাদের মান্যগণ্য ব্যক্তি।

আসুন।—ব'লে তপতী অভিমন্যুকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

মস্ত হল্ ঘর। আসবাবপত্রের ভিতর দিয়ে নিঃসংশয় আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে। শেজের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অভিমন্যু এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। তপতী দ্রুতহস্তে চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়ালো। বুকের কাঁপন তা'র এখনো থামেনি। একসময়ে বললে, রাত্রে চিনে এলে কেমন ক'রে? অসুবিধে হয়নি?

অভিমন্যু এতক্ষণ অবধি কোন কথা বলেনি। এবার বললে, সকালের দিকে একবার এসেছিলুম, তুমি ছিলে না।

সকালের দিকে! পোড়াকপালী আজ বেরিয়েছিল বটে সরকারি কাজে। দাই মাগি পুরুষ চেনে কিন্তু মানুষ চেনে না, তাই বোধ হয় সমাদরে বসায়নি। ছিলে কোথায় সারাদিন?

অভিমন্যু বললে, আমাদের লোক আছে এখানে, ঠিক জলে পড়িনি। তারপর, সবাইকে এড়িয়ে তোমার এখানে আসা। তা মন্দ কি, এই ত বেশ। এর নামই ত' রাম-রাজ্য! এপাশে দাই, ওপাশে খানসামা,—মাঝখানে আবার পাওয়া গেছে একটি কমলবাবু!

তপতী খুব হেসে উঠলো। বললে, না গো না, তিনিও একপাশের লোক। মাঝখানের ব্যক্তিটি এজীবনে বড়ই দুর্লভ। কিন্তু শোনো, আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি তোমাকে দেখে।

তুমি কি এখানে একা থাকো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি আর জুটলো কোথায়?

সম্পূর্ণ একা?

না গো—তোমার ছাইভস্ম চিঠিগুলো থাকে যে! ওগুলো-কেই ত সঙ্গী ঠাউরে নিয়েছি! বুঝতে পাচ্ছি লক্ষ্ণৌতে এসেছিলে কাজে, একবার দেখা ক'রে না গেলে বিবেকে বাধে,—তাই এসেছ। কেমন?

ঠিক তা নয়—অভিমন্যু বললে, তুমিই মুখ্য, গৌণ হোলো দলের কাজ।

তপতী বললে, রাতারাতি আমার দাম বেড়ে গেল কেন ?

দাম তোমার এখন অনেক, সে দাম দিচ্ছে সরকার। আমি এলুম একটা বোঝাপড়া করতে !

আমার সঙ্গে !

না, বেদেনীর সঙ্গে।

খানসামা চা নিয়ে এসে রাখলো। অভিমন্যু একবার সেইদিকে তাকিয়ে বললে, ওতে তেষ্টা যায়, ক্ষিধে যায় না !

খানসানার পাশ দিয়ে ছুটে তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গায়ে জড়ানো গরম চাদরখানা খুলে অভিমন্যু একপাশে সরিয়ে রাখলো। পরে পায়ের জুতোটা ছেড়ে গুছিয়ে ব'সে চায়ে যখন চুমুক দিল, তপতী তখন মিষ্টান্নের রেকাব নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এমন ক'রে অভিমন্যু কোনোদিন ক্ষুধা প্রকাশ করেনি, তপতী যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

অভিমন্যু বললে, তপতী, তোমার নিজের প্রতিজ্ঞা মনে আছে ?

তপতী বললে, খুব আছে।

কি বলো ত ?

স্বামী-স্ত্রী হয়ে উঠবো না কোনোদিন—কোনোদিন মানবো না সেই সম্পর্ক—

কতদিন পর্যন্ত ?

যতদিন পর্যন্ত থাকবে মতবিরোধ, আদর্শের পার্থক্য !

বিরোধ আর পার্থক্য যদি চিরদিন থাকে ?

তপতী কিয়ৎক্ষণ অভিমন্যুর দিকে তাকালো। পরে বললে, আমাকে তুমি পুড়িয়ে-পুড়িয়ে লোহার মতো শক্ত করেছ। যদি চিরদিন বিরোধ থাকে তবে এপারে থাকুক চক্রবাক, ওপারে কাঁদুক চক্রবাকী। একথা আর কোনদিন তুলো না, অভি !

অভিমন্যু চুপ ক'রে রইলো। তপতী এগিয়ে এসে অভিমন্যুর গায়ের চাদরটি গুছিয়ে রাখলো, তারপর হেঁট হয়ে তার পায়ের জুতো জোড়াটা নিয়ে ওদিকের র‍্যাকে সযত্নে তুলে রেখে দিল।

সেইদিকে লক্ষ্য ক'রে একসময় অভিমন্যু ডাকলো, বেদেনি !

তপতীর চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। বললে, তুমি কি এই কথাই বলতে এসেছ এত পথ পেরিয়ে ?

অভিমন্যু বললে, এর মীমাংসার পথ আছে কিন্তু।

বোধ হয় না।

তবে কি চক্রবাকী ব'সে ব'সে শুধু কাঁদতেই থাকবে ? এপারে এসে মিলবে না কোনোদিন ?

তপতী মুখ তুলে বললে, ছি অভি, তোমার সেদিনের শিক্ষাকে কি আমার হাত দিয়ে নীচে নামাতে চাও ?

না—অভিমন্যু বললে, কিন্তু তোমাকে আমার বড় দরকার!

দরকার! আমাকে দিয়ে খাটিয়ে নেবে,—দাম দেবে না কোনোদিন?

অভিমন্যু বললে, তোমার কণ্ঠে আছে উত্তাপ, স্বভাবে আছে তেজস্বিতা, বাচনে আছে দৃঢ়তা! এইগুলোই আমার দরকার!

বাঁকা চোখে চেয়ে তপতী বললে, এই চাটুবাক্যের পিছনে তোমার আসল অভিসন্ধি কি বলো ত?

তোমাকে আমি ধারালো অস্ত্র বানিয়ে তুলতে চাই—যা দিয়ে একদিন সংঘাত বাধানো সহজ হবে।

তপতী তা'র মুখের দিকে চেয়ে রইলো। অভিমন্যু ঈষৎ আকুলতা প্রকাশ ক'রে বললে, একদিন তুমি ছিলে সহচারিণী, তোমাকে স্ত্রীরূপে পাবো এই গর্ব ছিল মনে—হয়ত সেদিক থেকে জীবনটা সার্থকও হোতো—

তপতী তাড়াতাড়ি অভিমন্যুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, ছি, সংযম হারিয়ো না! তুমি না বলেছিলে, মন-দেয়া-নেয়ার ভাষা কোনোদিন উচ্চারণ করবে না?

অভিমন্যু বললে, তুমি গৃহিণী হ'তে চাওনি, চেয়েছিলে সহধর্মিণী হ'তে—মনে পড়ে?

পড়ে!—তপতী বললে, কিন্তু সেই ধর্মটা নিয়েই যে বিরোধ! তোমার ধর্ম যে একমাত্র সংহার ছাড়া আর

কিছু জানলো না। আমি ত' কেবল ভাঙবার জন্মেই জন্মাইনি, অভি!

অভিমন্যু বললে, বহুযুগের দুর্নীতিকে তুমিই বা বাঁচাতে চাও কেন, বেদেনী!

দুর্নীতি বাঁচে না অভি—কেননা সে নিজেই নিজের মৃত্যু-বীজ বহন করে! কিন্তু তুমিই একদিন বলেছিলে, কোনো একটা রাজনীতিক মতবাদের থেকে সংহারবৃত্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালে তারও অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তুমি চাও ধ্বংসের দ্বারা পরিবর্তন, আমি চাই কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা নতুন সৃষ্টি।

অভিমন্যু বক্রকণ্ঠে বললে, এবার বোধ হয় ভারতীয় সংস্কৃতির কথা তুলবে?

না—তপতী বললে, বিচার-বুদ্ধির কথা তুলবো—যেটার অভাব ঘটেছে তোমাদের মধ্যে। চেয়ে দেখো দেশের দিকে। দুশো বছর শোষণের মার, তারপর উৎপীড়নের মার,—তারপর সব চেয়ে সর্বনেশে মার এই যুদ্ধে—যেটা শেষ হয়ে গেল। ভাত নেই, কাপড় নেই, মেরুদণ্ড নেই,—চরিত্রের সততা পর্যন্ত হারিয়েছে! যারা সেদিনও ছিল সাধুসজ্জন তারাও লোভ আর দুর্নীতিতে তলিয়ে যাচ্ছে। কেন এই নৈতিক সঙ্কট, কেন বা এই অধঃপতন? বিচার ক'রে দেখেছ কি? বিরোধ তোমার সঙ্গে আমার এইখানে। যারা ডুবে যাচ্ছে নোংরায়, তোমরা খুঁচিয়ে তুলতে চাও তাদের লোভ, তাদের হিংসা, তাদের বিদ্বেষবুদ্ধি। তোমরা মাঠের

মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছ সাপের দল,—তারা গিয়ে উঠছে চাষার ঘরে; তোমরা কল-কারখানার আশেপাশে ছেড়ে দিচ্ছ ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের দল—যারা রক্তের আস্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠছে। যারা মরতে বসেছে দুর্ভিক্ষের মার খেয়ে, তাদের সেই কঙ্কালকে মাদকের দ্বারা উত্তেজিত ক'রে তুলছ। তোমরা ছড়াচ্ছ আক্রোশ আর বিদ্বেষ, খেলা করছ প্রাণ নিয়ে, তুচ্ছ ক'রে দিচ্ছ মানুষের শান্তির নীড়-রচনার প্রয়াস। জল যখন ঘুলিয়ে উঠেছে চারিদিকে তোমরা তখন মাছ ধ'রে নিয়ে পালাতে চাও!

অভিমন্যু বললে, তপতী, শেষের কথাটায় তুমি আঘাত দিতে চাও। তুমি কি দেখেছ ব্যক্তিগত লাভের জন্যে আমরা কোনো কাজ আজ অবধি করেছি? মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি?

তপতী বললে, শোনো, দুষ্প্রবৃত্তির একটা মোহ আছে। সে নষ্ট করে, ভেংচায়, অকারণে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, পিছন থেকে পিঠে ছুরি বসায়, দোকান লুট ক'রে মালপত্র ছড়িয়ে দেয় পথে, রাজপথে অহেতুক অশান্তি বাধিয়ে মজা লোটে, ভদ্র পথচারীর গায়ে কাদা ছিটিয়ে আমোদ পায়,—সেইগুলোই তাদের ব্যক্তিগত লাভ। ইঁট-পাটকেল ছুড়লো পুলিশের পিঠে, বোমা ফেললো মিলিটারী লরিতে, ট্রাম-লাইনের তলায় বারুদ ফাটালো, পেট্রল ঢেলে পোড়ালো যান-বাহন, সেই তাদের পরম আনন্দ। ইংরেজ আমলে

এরা হাততালি পেয়েছে—বুঝতেই পারো কারণটা স্পষ্ট। কিন্তু এখন? মারছে কা'কে? নষ্ট করছে কা'র জিনিষ? ভাঙতে চাইছে কা'র ঘর? তাড়াতে চাইছে কা'দের? চেয়ে দেখো, সাহেবদের শয়তানি বুদ্ধি আমাদের দিকে চেয়ে এখন মুখ টিপে হাসছে। সব চেয়ে সাংঘাতিক শত্রু ছিল ওরা মাত্র এই সেদিন। কিন্তু চেয়ে দেখো, সব চেয়ে নিরাপদে, সব চেয়ে সুখে ওরা আজ বাস করছে।

অভিমন্যু বললে, কেমন ক'রে জানলে তুমি?

খবর নাওগে কলকাতায় গিয়ে।—তপতী বললে, নিঃশব্দে লক্ষ্য করো তাদের ব্যাঙ্কের উন্নতি, তাদের কল-কারখানার পর্বত প্রমাণ লাভ, তাদের মাল-আমদানি-রপ্তানিব পরিমাণ, তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়, তাদের প্রভূত ধনবৃদ্ধি, তাদের বিলাস-ব্যসন,—দেখে অবাক হয়ে যাবে। স্বাধীনতার আগে তাদের যে-ব্যবসায়ের দাম ছিল এক কোটি, স্বাধীনতার পরে এদেশে তা'রা সেই কারবার বিক্রি করেছে পাঁচ কোটিতে,—এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে সেটাকে পরিণত করেছে পঁচিশ কোটীতে,—আর লেন-দেন করছে একশো কোটী টাকার। খবর রাখো? নগরে নগরে তোমরা পোড়া-মাটীর নীতি চালিয়েছ মনের আনন্দে, সাহেবরা সেখানে নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করছে পরম উল্লাসে। লাভটা কা'র? তোমরা যখন এদেশে ধর্মঘট, অশান্তি, গৃহযুদ্ধ আর নানা নোংরামি বাধিয়ে ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ করছ, ওরা

তখন সুরঙ্গপথ দিয়ে বিদেশ থেকে আনছে কোটি কোটি টাকার খাদ্য, বস্ত্র, লোহা, সিমেণ্ট, যন্ত্রপাতি আর কলকজা, —বলো ত' কাদের সুবিধা হয়েছে? ব্যবসায়ী ইংরেজ এক-দিন এদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য এনেছিল মিলিটারি আর শাসনকর্তার দল। আজ তা'রা স'রে গেছে, কিন্তু নিরাপদে থেকে গেছে ধনকুবের ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। তোমরা গায়ের জোরে তাদের উচ্ছেদ করতে পারো, কিন্তু বুদ্ধির জোরে নয়। ইংরেজ সব দেশে গিয়ে সর্বনাশ করেছে, কিন্তু আত্মনাশ কখনো করেনি। তোমরা কোনো দেশে গিয়ে আজও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের যোগ্য হওনি—কিন্তু নিজের দেশে ব'সে বিবিধ চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছ। শুধু নির্বোধ জনসাধারণকে শেখাচ্ছ স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার, আর রাজ-নীতির মানে উচ্ছৃঙ্খলতা। দেশজোড়া অব্যবস্থার মাঝখানে সবাই যখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তোমরা তখন লোকের ফুটো চালায় দেশলাইর কাঠি জ্বেলে দিয়ে দুরবস্থাকে আরো জটিল ক'রে তুলছো।

অভিমন্যু চুপ ক'রে আড় হয়ে শুয়েছিল। কি যেন সন্দেহক্রমে তপতী কাছে স'রে এসে খাটের ধারে বসলো। পায়ের উপর হাত রেখে ডাকলো, কই, জবাব দিচ্ছ না যে?

সারাদিনের ক্লান্তির পর অভিমন্যু কতকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। চোখে তা'র তন্দ্রা আসছে। তবু বললে, মেয়েদের বক্তৃতায় জবাব দেবার কিছু থাকে?

তপতী এতক্ষণ পরে আনন্দের স্বচ্ছ হাসি হাসলো। বললে, তবে এই যে আমাদের দেশের দুচারজন মহীয়সী বিলেত-আমেরিকায় গিয়ে এমন চমৎকার বক্তৃতা করছেন,—এঁরা কি তোমার কাছে কিছুই নন ?

অভিমন্যু ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে বললে, বেদেনি, আর জ্বালিয়ো না। খেলাঘরের টিনের মোটর-গাড়ী,—দম দিলে ঘোরে। ছেলেরা তাই দেখে আনন্দে হাততালি দেয়।

মেয়েদের ওপর এমন পর্বত প্রমাণ অশ্রদ্ধা জমিয়ে তুললে কবে থেকে ? আমিও ত' তাদেরই একজন!

অভিমন্যু বললে, তোমার মাথাটা কেবল পুরুষ, আর বাকিটা সব মেয়ে, তাই তুমি সহনীয়!

সহনীয়! এই মাত্র ?

না। আরো কিছু!

তপতী চুপ ক'রে চেয়ে রইলো।

অভিমন্যু বললে, এমন কিছু, যার তুলনা পাইনে।

অদূরে আলোর শিখার মতোই তপতী ঈষৎ কেঁপে উঠলো। বললে, এবার কি আমাকে খুশি করতে চাও, অভি ?

না, কোনো কোনো কথা বলতে পারলে নিজেই খুশি হই।

তপতী ব্যস্ত হয়ে বললে, ওঠো, রাত হয়েছে। এবার খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোও দেখি ?

অভিমন্যু বললে, চিরন্তনী, আমি ঘুমোলেও কি তোমার চোখে ঘুম আসবে ?

হাসিমুখে তপতী বললে, বেলাবনের মাথায় শাওনের ধারা নামলে হয়ত জেগে থাকতে পারতুম।

একা-একা ?

একা জাগাতেই মধু, দুয়ে মিললে মধুর ঘুম !

অভিমন্যু বললে, তোমার ওই খানসামা আর দাইকে এখনই তাড়াতে পারো এ বাড়ী থেকে ?

বড় বড় চোখ ক'রে তপতী বললে, ওরা কি দোষ করলে ?

ওরা নিশ্চয় গোয়েন্দা !

তপতী প্রশ্ন করলো, তোমার মতলব কি বলো ত ?

আমি এখন উঠবো না। আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসো।

পাগলামি করো না, অভি—এই ব'লে ব্যস্ত হয়ে উঠে তপতী ঘরের দরজার কাছে এসে ডাকলো, দাই—?

ফরমাইয়ে, বাঈ।—দাই দূরের থেকে সাড়া দিল।

তপতী খাবার দিতে বললো।

রাত অনেক হয়েছিল সন্দেহ নেই। বাইরে বেশ শীত পড়েছে। সমারোহের সঙ্গে আহারাদি সেরে গরম জলে মুখ ধুয়ে অভিমন্যু উঠে এসে আবার নিজের জায়গাটা দখল ক'রে শুয়ে পড়লো। দাই আর খানসামা তাদের কাজ সেরে চলে গেল বাঈজীকে সেলাম জানিয়ে। এখানকার সমস্ত হাবভাব আর রীতিনীতি যেন সেই নবাবী আমলের স্মৃতিটাই বহন করছে। নতুন কেউ এলে তাকেও সেই পুরনো ছাঁচে মানিয়ে চলতে হয়।

অভিমন্যু প্রশ্ন করলো, তোমার শয্যাধার কোন্‌টি ?

আবার কোন্‌টি !—তপতী বললে, তোমার পায়ের ধূলোয় যেটি ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে উঠলো !

ওঃ এইটিই তবে ? তাই এত লাবণ্য, এমন মধুর উত্তাপ ! —সমস্ত বিছানাটাকে অভিমন্যু যেন দুই হাতের মধ্যে টানতে চাইলো।

তপতী গম্ভীর ভাবে বললে, অভি, এবার কিন্তু তোমার কথায় আর পরিহাস খুঁজে পাচ্ছিনে। বার বার জলের ধাক্কায় নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ে, তা জানো ? আমি ত' তোমার কোনো ক্ষতি করিনি !

অভিমন্যু বললে, অতিথির ওপর রাগ করতে নেই, মনে রেখো।

কিন্তু তোমার আতিথ্য নেবার চেহারাটা যে ভালো নয় ! তুমি ত ছেলেমানুষ নও ? নিজের আচরণ কি নিজে বুঝতে পারো না ?

অভিমন্যু উঠে বসলো। বললে, বেদেনি, তোমার মনে পড়ে, ঠাকুর-দেবতা যেদিন মানতুম, সেদিন তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলুম ?

তপতী বললে, সেটা অনেকটা কলঙ্কের দাগ, অনেকটাই ছেলেখেলা।

তুমি সে-দাগ মুছে ফেললে কেন ?

দাগ পড়বার আগেই মুছে ফেলেছি। যার সঙ্গে কখনও মিলবে না তা'র চিহ্ন মুছে যাওয়াই ভালো, অভি!

অভিমন্যু বললে, কিন্তু আমাকে তুমি ত' কখনো দূরে ঠেলোনি!

তপতী বললে, আমিও তোমার হাতে কখনো ধরা দিইনি, তাও তুমি জানো!

সেইটি আমার কাছে সকলের বড় বিস্ময়। তুমি মনে জানো আমিই তোমার স্বামী, আমি জানি তুমিই আমার স্ত্রী—তবু দুজনের জীবনে একি অঘটন! এর কি কোনো প্রতিকার নেই, বেদেনী?

ছিল!—তপতী বললে, যদি দুজনের একজন রাজনীতির চর্চা না করতুম জীবনে। এ বিরোধের কোনো মীমাংসা কোনোদিন হবে না! আমরা শুধু মেয়ে-পুরুষ নই, স্বামী-স্ত্রী নই,—আমরা দুটো পরস্পর-বিরোধী অভিমত। কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতে পারবো না।

অভিমন্যু বললে, আমি তোমার কাছে কেন এসেছিলুম, বলো ত? তোমার নরম বিছানার লোভে নয় নিশ্চয়ই?

তা জানি, তোমার আর যাই থাক্ সে-লোভ নেই। কিন্তু ছলে-বলে-কৌশলে তোমার দলে আমাকে নামাবে,—সে-শিক্ষা তুমি ত' আমাকে দাওনি?

তবে কি তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

কোথা যাবো?

পথে, গাছতলায়, মাঠে ঘাটে,—যেখানে সেখানে !

তপতী বললে, তোমার সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারি, নরকেও নামতে পারি,—কিন্তু দেশের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবো না, অভি।—চলো, আর নয়, অনেক রাত হয়েছে।

অভিমন্যু বললে, কিন্তু এই বিছানাটাই আমার বেশি পছন্দ !

তপতী বললে, দাইয়ের কাছে সকালে আমার মাথা হেঁট করাবে নাকি ? শিগগির ওঠো।—এই ব'লে সে অভিমন্যুর হাত ধ'রে টেনে তুললো।

পাশের ঘরেও সুন্দর বিছানা পাতা ছিল। অভিমন্যু উঠে এসে সেই বিছানায় নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। আলোটা কমিয়ে দিয়ে যাবার সময়ে নত হয়ে তপতী অভিমন্যুর পায়ের ধূলো নিল। কিন্তু উঠে যাবার আগেই অভিমন্যু তা'র হাতখানা ধ'রে ফেললো। বললে, বেদেনী, আমার রাশ আল্‌গা হয়নি, কিন্তু সংযম হারালে তুমি।

তপতী একটি কথাও বলতে পারলো না। শুধু হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে এ ঘরে এসে মাঝখানের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। চোখ দুটো জ্বালা করছিল তা'র, কিন্তু চোখের জল পড়লে তা'র কিছুতেই চলবে না। তটের বাঁধ যত মজবুতই হোক না কেন, অশ্রুর প্রবল প্রবাহে সে-বাঁধ ভেঙ্গে যেতে কতক্ষণ ?

আলো নিবিয়ে বিছানায় উঠে সে বালিশের মধ্যে মুখখানাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিল।

ওঘরের অন্ধকারে প'ড়ে রইলো যেন একটা ভাবী বিপ্লবের সাংঘাতিক পরিকল্পনা, এঘরে প'ড়ে রইলো একটা বেদনাহত বিক্ষুব্ধ ক্ষুধাজর্জর শান্তিকামনা।

আলোটা নিজের থেকেই নিভে যাচ্ছিল।

গোমতীর তীরভূমি ধ'রে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে, হেমন্তের সকালের সুন্দর মধুর রৌদ্র ছড়িয়ে রয়েছে। মাঠে মাঠে গমের ক্ষেত হয়ে রয়েছে সবুজ, মাঝে মাঝে আখের চাষ। নদীর এপার দিয়ে গ্রামের পথ ধ'রে যে-পথটি চ'লে এসেছে, কমলের মোটর সেই পথেই এসে সোজা বেলাবনের ভিতরে প্রবেশ করলো।

বাংলোর বারান্দার সামনে গাড়ী এসে থামলো। একটা বড় রকমের ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে কমল নেমে এসে অফিস ঘরে ঢুকলো। খানসামা খবর দিল তপতীকে।

তপতী বেরিয়ে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। কমল বললে, ভয়ে ভয়ে আসছি ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে।

ভয় কিসের, কমল ?

ফুল দেখে পাছে তুমি ক্ষেপে ওঠো। কিন্তু এ-ফুল উপহার নয়, এটা ঘুষ।

উদ্দেশ্য ?

শোনো,—এ জেলাটায় আটটা ডাক্তারখানা খোলা হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল কি জানো ? গ্রামের লোককে

বোঝানো কঠিন। অন্তত দু' এক জায়গায় যদি তোমাকে নিয়ে যাওয়া যেতো। সেক্রেটেরিয়েটের অনেকেই তোমার কথা বলছিলেন। তাই আনলুম একটা ফুলের তোড়া, যদি তোমার মন ভোলান যায়।

তপতী খুব হেসে উঠলো। তারপর পর্দাফেলা পাশের ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সে ডাকলো, গুরুমশাই, একবার এঘরে আসবেন ?

সহাস্যে অভিমন্যু এলো এঘরে। তপতী দুজনের পরিচয় করিয়ে বললে, এই হোলো শ্রীমান্ কমল,—কাল রাত্রে যার কথা বলছিলুম। সুভাষী, সুদর্শন ; যে-পরিমাণ বিদ্যে, বুদ্ধি সেই পরিমাণেই কম। ওকে দৈনিক একটা গল্প আমাকে শোনাতেই হবে,—নৈলে রূপকথার খোকার আবদার কিছুতেই শান্ত হবে না ! আর এঁকে দেখছ কমল, এঁর হাতেই আমার প্রথম হাতে-খড়ি। আমার দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি, একজন ভালো লেখক—

অভিমন্যু বললে, মেয়েরা সত্য বলে না, কমলবাবু—

কমল প্রশ্ন করলো, ওর নাম বললে না ত ?

তপতী হেসে বললে, আমার মতন খ্যাতি ত' আর ওঁর নেই,—তাই ওঁর নামের দাম কম। উনি হলেন মিস্টার রায়।

ইতিমধ্যে খানসামা গোটা দুই বাঁধা বিছানা আর সুটকেস বাইরে এনে রাখলো। কমল বললে, রায় মশাই এলেন কখন্ ?

তপতী বললে, তুমি যাবার পর উনি এসেছেন কাল রাত্রে।

এখনই যাচ্ছেন বুঝি ?

হ্যাঁ, তবে উনি একা নন্ কমল, আমিও যাবো।

তুমিও ? হা কপাল, ফুলের তোড়া আনাই মিথ্যে !

অভিমন্যু আর তপতী দুজনেই হেসে উঠলো। তপতী বললে, শুনুন গুরুমশাই,—চাটুবাক্যে কমল একেবারে ওস্তাদ। আমি ওকে কি কথা দিয়েছি জানেন ? পরজন্মে যদি বিয়ে করি কখনো,—কমলকে যেন দেবর পাই।

অভিমন্যু সহাস্যে বললে, পুরুষ চায় নগদ বিদায়। ধারে কারবার তা'র দুচোখের বিষ। সুতরাং বর্তমান জন্মে উনি বঞ্চিত না হ'লে আমিও খুশী হবো।

বলুন ত'—বলুন ত' মশাই—কমল উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

তপতী বললে, ওদিকে ট্রেনের সময় হোলো, উঠুন এবার। সেই সকাল থেকে টম্‌টম্ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কমল বললে, কোথায় যাচ্ছেন এখন ?

তপতীই জবাব দিল, গুরুকে শরণ ক'রে অকূলে পাড়ি দিচ্ছি, জানিনে কোথায় গিয়ে ভেসে উঠবো।

কবে ফিরবে ?

কিছুদিনের মধ্যেই।

কমল বললে, টমটম ছেড়ে দিন্—আমার গাড়ীতে চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।

অভিমন্যু বললে, আপনার অন্য কাজ নেই ?

কমল বললে, তবে শুনুন দুঃখের কথা বলি। আমার কাজ হোলো এই জেলার সর্বত্র চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা। কিন্তু এদেশের লোক নিজেদের ভালো কিছুতেই বুঝবে না। তাদের নানাবিষয় বোঝাতে হয়,—কিন্তু বোঝাবে কে?

তপতী বললে, তাই ওর হয়ে আমাকে ব্যাগার খাটতে হয়। তাই ফুলেব তোড়া, তাই চাটুবাক্য, তাই দেবরত্বলাভের কামনা।

টমটমখানাকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। খানসামা আর দাইয়ের ওপব দায়িত্বভার বুঝিয়ে তিনজনে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। তপতীর একটু আশঙ্কা ছিল, অভিমন্যুর আসল পবিচয় কমল কথায় কথায় বুঝতে না পারে। শুধু কমল নয়, সরকারী লোকদেরও দৃষ্টি তা'র ওপর না পড়ে এই ছিল তপতীর ভয়। অভিমন্যুর সাহচর্যের সংবাদটা তা'র পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

চলন্ত গাড়ীর মধ্যে ব'সে কমল বললে, রায়মশায়, আপনি আমারও গুরুস্থানীয়, কিন্তু একটা কথা বলি যদি অভয় দেন্।

সহাস্যে অভিমন্যু বললে, নিশ্চয়! কি শুনি?

আপনি এমন শিক্ষাই দিয়েছেন তপতী দেবীকে যে, উনি এ জীবনে কোনো খোপেই খাপ খেলেন না। মাথার স্ক্রু প্রায় চিবদিনই ঢিলে হয়ে রইলো।

তপতী বললে, কমল, তুমি নিজে কত বড় সংসারী হে?

কমল বললে, আমি! তুমি কি জানো সামনেব ফেব্রুয়ারী মাসে আমার বিয়ে?

কোন্ পোড়াকপালীর সঙ্গে ?

দেখে নিয়ো, দেখে নিয়ো। অন্তত সে আর যেই হোক, রাজনীতি করতে গিয়ে সে নিজের কপাল পোড়ায়নি। আচ্ছা রায়মশাই, মেয়েদের বক্তৃতা আপনি শুনেছেন কখনো ?

অভিমন্যু হেসে বললে, কাল অর্ধেক রাত পর্যন্ত—তার-পরে আজ আবার শেষ রাত থেকে—

কি মনে হয়েছে আপনার ?

অভিমন্যু বাঁকা চোখে তপতীর দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে, যদি আপনার সঙ্গে আবার কখনো একলা দেখা হয় তখন বলবো।

তপতী ও কমল উচ্চরোলে হেসে উঠলো। গাড়ী এসে পৌছলো লক্ষ্নৌ ষ্টেশনে।

কমল ওদের নামিয়ে দিয়েই চ'লে যেতো, কিন্তু ট্রেন ছাড়াব সময় হয়েছে দেখে সে গাড়ীখানা বাইরে রেখে একটু দাঁড়িয়ে গেল। সেও অল্পক্ষণ। সামান্য মালপত্র তুলে দিয়ে গাড়ীতে দুজনে উঠে বসতেই গার্ডের হুইসল্ পড়লো।

মুখ বাড়িয়ে তপতী বললে, তুমি আমার অফিসে একটু খবর দিয়ো, ভাই,—ব'লে দিয়ো দিল্লীর দপ্তরে আমি পরে একটা খবর পাঠিয়ে দেবো।

কমল হাসিমুখে বললে, আচ্ছা ব'লে দেবো। কিন্তু তুমি ফিরবে কবে ? লক্ষ্নৌ যে অন্ধকার হয়ে রইলো !

দুষ্টু কোথাকার!—তপতী হাসিমুখে জানলা থেকে মুখ নিল ফিরিয়ে।

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

লক্ষ্ণৌ অন্ধকার না হোক, অন্তত কমলের একটা বড় রকমের অবলম্বন আপাতত সরে গেল সন্দেহ নেই। এই ছোকরার সঙ্গে স্থানীয় বাঙ্গালী মহলের পরিচয় বড় অল্প। সংসারেও তা'র বিশেষ কেউ ছিল না। সরকারি কাজ নিয়ে ঘোরাঘুরির সময় ঘটনাচক্রে তপতীর সঙ্গে তা'র পরিচয় হয়ে যায়; সেই পরিচয় ক্রমে মধুর সখ্যতায় পরিণত হয়। ছেলেটির নির্লোভ স্বভাব প্রকৃতি প্রথম থেকেই তপতীকে আকর্ষণ করে।

গাড়ীতে উঠে হঠাৎ কমলের মনে হোলো, তাইত, তপতী চললো কোথায়, জানা গেল না ত? কোন্ ঠিকানায় সে উঠবে তাও জিজ্ঞাসা করা হোলো না!

কমল আবার ছুটতে ছুটতে এলো প্লাট্‌ফরমে, কিন্তু ট্রেন তখন বেরিয়ে গেছে অনেকদূর।

খবর নিয়ে সে জানতে পারলো, এ গাড়ী যাবে কানপুর। বুঝতে পারা গেল, কলকাতার দিকে ওরা এখন যাবে না। কমল খুশি হয়ে ভাবলো, তপতী ফিরবে তবে শীঘ্রই।

ছোট্ট সেকেণ্ড ক্লাস কুপেতে ওরা দুজনে উঠে বসেছিল। দাই কিছু ফল আর মিষ্টান্ন দিয়েছিল সঙ্গে, তপতী সেগুলি

একে একে বা'র করলো। সাধারণত খানসামার ছোট ছেলেটাকে সে সঙ্গে নেয়, কিন্তু ছেলেটা কয়দিন থেকে গিয়ে রয়েছে তা'র মামার বাড়ী। ছট্টু তার নানা ফাই-ফরমাস খাটে।

খাবার বাটিটা অভিমন্যুর সামনে দিয়ে তপতী প্রশ্ন করলো, দেশ চুলোয় যাকগে, নিজেদের বিতর্ক নিয়ে আমরা এতই ব্যস্ত যে, মা-বাবার খোঁজটাও একবার নিইনি তোমার কাছে।

অভিমন্যু বললে, তাঁরা সত্যি মা-বাবা হ'লে নিতে বৈকি!

ছি, এমন কথা বলো না, অভি। তুমি কি আসবার সময় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

না।

তুমিও ত' কম অকৃতজ্ঞ নয়!

আমার অপরাধ?

প্রাতঃস্নানের পর তপতীর মাথার চুল তখনও ভিজা। এলো খোঁপা ফিরিয়ে রেখেছে সে পিছন দিকে। কিন্তু সেই কম্বুগ্রীবা হেলিয়ে সে বললে, তোমার বেদেনীকে তাঁরা মানুষ ক'রে তুলেছেন, এজন্যে তোমার কৃতজ্ঞতা নেই?

অভিমন্যু বললে, না।

কেন?

বেদেনী মানুষ হয়নি! এবং সে আমারও নয়!

তপতী বললে, সকালবেলা আবার বুঝি তর্কজাল বিস্তার করতে চাও? বাইরের দৃশ্য দেখো দেখি কী চমৎকার!

তুমি না ছোটবেলা কবিতা লিখতে? সেগুলো কোথায় রেখেছ বলো ত?

অভিমন্যু জবাব দিল না। এক সময়ে খেতে খেতে বললে, তুমি তোমার মা-বাবার ওপর অবিচার করেছ, বেদেনী।

তপতী বললে, কেন?

তাঁদের যোগ্য মূল্য তুমি দাওনি। সত্যি মা-বাপ হ'লে এ তুমি পারতে না!

তাঁদের ঘরে টুকটুকে জামাইটিকে ছেড়ে দিলেই কি যোগ্য মূল্য দেওয়া হোতো?

অভিমন্যু বললে, অন্তত তাঁদের কাছে থাকতেও পারতে! তাঁরা তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন!

তপতী বললে, অভি, মুস্কিল হয়েছে সেইখানে! লেখা-পড়াটা এক এক জীবনে এক এক রকম ফল ফলায়। অনেকে তোমার মতন পাণ্ডিত্য নিয়েও উচ্ছন্নে যায়, অনেকে আমার মতন অল্প বিদ্যে নিয়েও সৎপথে যাবার চেষ্টা করে।

অভিমন্যু বললে, সৎ আর অসৎ পথের ব্যাখ্যাটা কি রকম?

যে ব্যাখ্যা চিরকাল ধ'রে চিন্তাশীলরা দিয়ে এসেছে!

অভিমন্যু বললে, তা'রা ব'লে এসেছে মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী, —জননী, ভগিনী, জায়া—তা'রা হোলো পুরুষের শক্তি! তুমি কি এগুলো বর্ণে বর্ণে পালন করছ?

ক্ষীরের নাড়ু অভিমন্যুর হাতে তুলে দিয়ে তপতী

বললে, আগে মিষ্টিমুখ করো পরে জবাব দেবো।—শোনো, ছোট ঘর বড় হয়ে যায় শিক্ষার গুণে। গৃহলক্ষ্মী বলছ, গৃহকর্ত্রী বলতে তোমাদের বাধে। সভ্যতার প্রথম জন্ম কোথায় জানো? নারীর গর্ভে! কেননা মানুষই সৃষ্টি করে সভ্যতা। প্রথম যেদিন আমি ভূমিষ্ঠ হলাম সেদিন জননী ভগিনী জায়া কোনোটাই ছিলুম না,—ওগুলো হয়ে ওঠে চলতি সমাজরীতির থেকে। প্রথম আমি মেয়ে, তারপর গৃহলক্ষ্মী, তারপর শক্তি! ঘর আমার অনেক বড়, অভি, —সমস্ত সুন্দর ভারতের পাহাড় পর্বত নদী বন প্রান্তর কান্তার সমুদ্র নিয়ে। প্রতি তৃণফলকে আমি, প্রতি ধূলি-মাটিকণায়, প্রতি বিন্দু জলে, প্রতিটি শস্যের দানায়।

বোধ হয় অভিমন্যু তা'র কোনো একটা কোমল তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছিল,—তপতীর মুখ চোখ দপ দপ করতে লাগলো।—গ্রামে জনপদে পথে-পথে চেয়ে দেখো, ওরা আমার সন্তান নয় কি? ওদের সুখ-দুঃখে ভালো মন্দে, আঘাতে-আনন্দে আমার মন কেন দুলে ওঠে বলতে পারো? এটা শিক্ষার কথা, ভাবাবেগের কথা নয়, বিশ্বাস করো। যে কোনো মহাপুরুষ আমার পিতা, যে কোনো দেশকর্মী আমার ভাই, যে কোনো মহীয়সী আমার জননী!

হু হু শব্দে ট্রেন চলেছে। বোধ হয় ডাকগাড়ী, একে একে অনেকগুলো স্টেশন পেরিয়ে গেল, কোথাও থামলো না। তপতী বলতে লাগলো, মা বাবার ওপর অবিচার

করিনি আমি, আমি শুধু নিজের ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি। দরকার ছিল কিছু ঘরের? এ যুগের চারিদিকের ভয়ানক অশিক্ষার মাঝখানে এই শিক্ষাই কি বড় নয় যে, দেশকে গুছিয়ে তোলো? আলো দাও, স্বাস্থ্য দাও, শিক্ষা দাও, প্রাণ দাও? ছোট ঘর ভেঙ্গে বড় ঘরে ঢুকেছি, এটা কি অবিচার? আমাকে তাঁরা একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন,—এই আনন্দ আমার জীবনে যে কত বড় তোমায় কেমন ক'রে বোঝাবো?

অভিমন্যু বললে, আনন্দ কিসের?

তপতী বললে, বলো ত?

জাতি-গোত্র-পরিচয় হীন,—আকর্ষণ-বিকর্ষণ কোনোটাই নেই, এও হ'তে পারে।

মিথ্যে নয়—তপতী বললে, কিন্তু তা'র চেয়েও বড় কারণ হোলো, পথের ধূলো মেখে একদিন ঘরে উঠেছিলুম, আজ আবার নামতে পেরেছি সেই পথের ধূলোয়। টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়তে পারিনে এই দেশে? পারিনে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যেতে? সেদিনও মনে এই কামনা ছিল, যদি আমার মরণ ঘটে তুমি আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ো, আমাকে একান্ন খণ্ডে ছড়িয়ে দিয়ো এই দেশের সকল খানে। আর যদি চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হই, তবে সেই ভস্মকণা যেন হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।

এবার যেন কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী থামলো।

অভিমন্যু একটা পাত্র নিয়ে জল আনতে গেল। কথা বলতে বলতে তপতীর মুখের উপরে দীপ্তি ফুটেছিল, যেন আগুন রয়েছে ভিতরে, তা'র আভা প্রকাশ পাচ্ছে মুখে। স্টেশনের কত লোক দেখে চলেছে তা'র মুখের ছবিটি জানলার পটে। কিন্তু তপতী তাকিয়েছিল অভিমন্যুর দিকে। অভিমন্যুর দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান দেহ সে এমন ক'রে অনেকদিন যেন দেখেনি। কী পরিচ্ছন্ন শান্ত সংযত চেহারা, মুখখানা আজও মসৃণ সুকুমার,—আজও তাকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। ক্ষত্রিয়ের বর্ণ আরও যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে সকালের স্নানের পর। একাগ্র অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তপতী তাকে আর একবার যেন নতুন ক'রে দেখে নিল।

অভিমন্যু জল নিয়ে এসে উঠলো। গাড়ীও ছেড়ে দিল। গুছিয়ে পাশে ব'সে অভিমন্যু বললে, আমার কথা ত' শুনলে না, কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ বলো ত?

তপতী হাসিমুখে বললে, তোমার কথা শুনলে তুমি নিয়ে যেতে কোথায়?

নিয়ে যেতুম! নিয়ে যেতুম দারিদ্র্যের তলায়, সবহারাদের মাঝখানে—যাদের কান্না আটকে যায় ক্ষুধার তাড়নায়। যারা নীচের তলায় ব'সে রয়েছে রক্তচক্ষে!

কেন নিয়ে যেতে সেখানে?

সেখানে গেলে তোমার চোখ ফুটতো! বুঝতে পারতে যে, তোমাদের উপরতলাকার চাকচিক্য কত হাস্যকর।

তপতী চুপ ক'রে রইলো। অভিমন্যু সাগ্রহে বললে, যাবে আমার সঙ্গে ?

না—

তাহ'লে আমাকে নিয়ে চলেছ কোথায় ?

তপতী মুখ ফিরিয়ে বললে, ধরো কোন্ এক পাহাড়ের কোলে, কি এক নদীর ধারে !

অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করলো, সেখানে গিয়ে কি হবে ?

কানে কানে কিছু কথা শোনাবো !

আবার তোমার সেই ছেলেমানুষী কাব্য ?

তপতী হেসে বললে, তোমার সর্বহারাও মরবে, কোটি-পতিও বাঁচবে না, থাকবে ওই কাব্য। থাকবে চিরকাল তোমার আমার আনন্দপিপাসু মন !

অভিমন্যু বললে, তোমার এই অধ্যাত্মদর্শনের উৎপত্তি কোথায় জানো ? ধনতন্ত্রী সমাজে ! এদেশে বড়লোকরা মোটা টাকা খরচ ক'রে গানের সঙ্গে বাইজি নাচায়, আর নামাবলী-পরা ভিখিরীরা দেহতত্ত্বের গান গেয়ে পেট চালায়। সেদিনকার দুর্ভিক্ষে কী শিক্ষা পেলে ? চাষী যদি না খেয়ে মরে, তবে ধনীর ঘরেও ঘোর বিপদ। কোথায় থাকবে তোমার কাব্য যদি পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে ? বনিয়াদে যার ঘুণ ধরেছে সে কেন প্রাসাদের উপর তলায় ব'সে ভারত-সংস্কৃতির আভিজাত্য নিয়ে সগর্বে চেঁচায় ?

তপতী আবার হাসলো। বললে, তুমি ঝগড়া করছ

কা'র সঙ্গে জানো? আয়নার মধ্যে নিজের যে-ছায়াটা পড়েছে তারই সঙ্গে! তুমি ত' ধনীর দুলাল, লালিত হয়েছ আদরে। সবহারাদের তুমি জানো কতটুকু? উপোস ক'রে তুমি কখনো মরতে বসেছ? অভাবে তোমার চোখ জ্বলেছে কখনো? কখনো করেছ কুলিগিরি? কখনো মাঠের কাদায় লাঙ্গল ঠেলেছ? তোমরা ত' সবহারাদের দালাল,— সুযোগ বুঝে তাদের কিছু পাইয়ে দাও, নিজের ঘটটাও ভরিয়ে নাও। অনেক প্রমাণ আমার হাতেই আছে, অভি, প্রতিবাদ করো না।

অভিমন্যু হেসে বললে, কিন্তু আজকের স্বাধীনতা কাদের জন্যে? শতকরা নব্বইজন কারা? তা'রা মাঠেব আর কারখানার লোক নয় কি?

থামো—তপতী বললে, তাদেব ভাবনা তাদেরই ভাবতে দাও। কিন্তু চল্লিশ কোটির স্বাধীনতা এনেছে চল্লিশ লাখ— এরা কে? সৈন্য নয়, পুলিশ নয়, চাষীমজুর নয়,—এরা সেই মধ্যবিত্ত! চাষী-মজুরের বিদ্রোহে ইংরেজ পালায়নি, তা'রা পালিয়েছে মধ্যবিত্তের অবাধ্যতায়,—যাদের ঘাড়ের ওপুরে ছিল ইংরেজ শাসনের ভিত্তি! চাষীমজুরের মনের কথা যেদিন সত্যিকার চাষীমজুররা বলবে সেইদিন শুনবো কান পেতে। তাদের রাজনীতি তা'রা গড়ুক, তাদের সাহিত্য তা'রা সৃষ্টি করুক, তাদের জীবননীতি তাদেরই হাতে তৈরী হোক। তুমি কাঁদো কেন তাদের দুঃখে? তুমি আক্রোশ

আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়াও কেন নগরের রাজপথে ? দেখেছি তোমাদের কীর্তি কলকাতায়। নির্বোধ-নিরীহ মজুরদের ডেকে আনো কারখানা থেকে, তাদের হাতে তুলে দাও রং করা কাগজের ঝাণ্ডা, ট্যাঁকে গুঁজে দাও একটি ক'রে টাকা,—মুখে একটা বুলি দিয়ে দাও—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। দেখেছ তাদের শোভাযাত্রা পথে দাঁড়িয়ে ? হাসতে হাসতে যায় পান চিবিয়ে বিড়ি টানতে টানতে,—সন্ধ্যার পর সেই টাকাটা যায় শুঁড়ির দোকানে। তারাও জানে তোমরা তাদের নেতা নও, তোমরাও জানো তারা তোমাদের কেউ নয়। যেমন কৃত্রিম, তেমনি অসার তোমাদের এই নির্লজ্জ আন্দোলন, নেতৃত্ব-লাভের এই হাস্যকর চেষ্টা। এই সেদিন কতকগুলো কয়লার খনি আর কুলিধাওড়া দেখে এলুম,—সেখানেও তোমাদের সেই দালালি। তোমরা চেঁচামেচি ক'রে বাড়ালে মজুরির পরিমাণ,—ফল কি হোলো শুনবে ?

তপতী থামলো।

অভিমন্যু বললে, মজুরির পরিমাণ নীচে নামিয়ে রেখে তাদের উঠতে দিয়েছ কোনোদিন ?

তপতী হেসে উঠলো। বললে, শোনো, এখন তা'রা উঠেছে ! কোথায় উঠেছে তাও বলি। একটি সাধারণ কুলি-পরিবারের আয় আজ কত জানো ? খুব কম পক্ষে সাড়ে তিনশো টাকা। অর্থাৎ একটি শিক্ষিত ভদ্র গৃহস্থের আয়ের চেয়ে বরং বেশী ত' কম নয়। এ ছাড়া মাথা পিছু দৈনিক

আধসের চাল পায় বিনামূল্যে, এবং মাসে একখানা কাপড়। ফলে সমস্ত কয়লাখনির আশে পাশে কাপড়ের চোরাবাজার বেশ ভালোই চলছে,—কেননা বারো খানা কাপড় এক বছরে লাগে না। কোথাও চা'ল নেই,—যাও কুলিধাওড়ার পাশে,—চা'ল চাইলেই পাবে। সর্বসাকুল্যে একটি পরিবারের মাসে খরচ হয় একশো টাকা। বাকি আড়াইশো টাকা কি হয় জানো? বেশীর ভাগ টাকায় বোতলের মদ, বাকি টাকায় মেয়েরা কেনে সোনা। কুলিরা আগে পচাই খেতো,—তা'র মধ্যে নেশা আর খাদ্যবস্তু দুই থাকতো। কিন্তু এখন তা'রা বড়লোক, সুতরাং বোতলের মদ ছাড়া এখন তাদের রুচি আসে না। কিন্তু বোতলে যে সুধু নেশা, খাদ্যপ্রাণ নেই,—একথা কি তোমরা তাদের বুঝিয়েছ? জেনেছ কি দশ বছর আগেকার চেয়ে আজ তাদের স্বাস্থ্য কত জীর্ণ? দেখেছ কি মজুরির পরিমাণ বাড়াবার পর কুলীদের পরিবারে দুষ্ট ব্যাধির কি ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে? অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় বিনামূল্যে পেয়েও উন্নতি কি হয়েছে তা'দের? বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তা'রা আকৃষ্ট হয়েছে কি? কেন হয়নি? কার দোষে? খবর রেখেছ কি? দেখে এসো সেখানে শ্রমিক নেতাদের বিলাসব্যসন, দেখে এসো তা'দের ব্যাঙ্কের আমানত। তা'রা অত টাকা পায় কোথায়? তাদের গোপন গতিবিধির খবর জানো কি? ফলে হয়েছে এই, সপ্তাহে আগে কুলি-কামিনরা ছয়দিন কয়লা কাটতো,—এখন কাটে তিন

দিন! মদ খেয়ে জীর্ণ দেহ প'ড়ে থাকে বাকি চা'র দিন! আন্দোলন করছ তোমরা তাদের নিয়ে, কিন্তু তাদের দিয়ে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াতে পেরেছ কি?

অভিমন্যুর জবাব ছিল মুখে, কিন্তু শান্ত হয়ে সে ব'সে ছিল।

তপতী তা'র দিকে চেয়ে বললে, এবার চলো চাষীর ঘরে। আগে তারা ধান বিক্রি করতো দশ আনায়, এখন বেচে সাড়ে সাত টাকায়। টাকা যাচ্ছে তাদের ঘরে, কিন্তু চাষীদের উন্নতি হয়েছে কি? গড়েছে কোনো বড় রকমের সমবায় প্রতিষ্ঠান? গ্রামের কোনো শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে? জমিদাররা না হয় মরতে বসেছে, কিন্তু চাষীরা কি বেঁচে উঠেছে? দেশে ফসল কই? খাদ্য কই? এত অপমৃত্যু, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, জীবনীশক্তির অভাব—এসব কেন বলতে পারো?

অভিমন্যু বললে, এর প্রতিকার তোমার কতটুকু জানা আছে, বেদেনী?

চলন্ত গাড়ীর বাইরে তপতী কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইলো। দূর প্রান্তরে মধ্যাহ্ন রৌদ্র ঝলমল করছে। কোনো কোনো বিলের ধারে শান্ত হয়ে বসেছে বকের সারি। ফসলের মাঠে কোথাও কোথাও চাষীরা কাজ ক'রে চলেছে। সেই প্রাচীন পৃথিবী, সেই সুপরিচিত ফসলের ক্ষেত, আকাশ সেই নীল নির্মল,—জলাবিলের উপরে সোনার সূর্যালোকের সেই আদিম শোভা। অশান্তি কোথাও নেই, অশান্ত শুধু মানুষের মন।

সেই দিকে চেয়ে তপতী বললে, কতটুকু বিদ্যে আমার, কতটুকুই বা জানি। হয়ত প্রতিকার আছে, কিন্তু সে কি মানুষের হাতে? কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি জীবনের অশান্ত অধীর সমস্যা,—তা'র সমাধান তোমার-আমার হাতে সত্যিই কি ঘটবে?

অভিমন্যু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। কেননা আলাপ-আলোচনার মাঝখানে কখনো সে দৈবশক্তির ইঙ্গিত বরদাস্ত করে না। সে বললে, মানুষের দুঃখ দুর্দশার সমাধান মানুষ ছাড়া আর কা'র হাতে?

মিষ্টকণ্ঠে তপতী বললে, তবে পৃথিবীজোড়া এই চাঞ্চল্য কেন?

চাঞ্চল্যটা দু'মুখো—দেখতে পাচ্ছ না?

তপতী তা'র প্রতি তাকালো।

অভিমন্যু বললে, এক পক্ষের চাঞ্চল্য—পাছে হারায়! এতকালের জমানো ধনদৌলত, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, স্বার্থ ও সুবিধা, পাছে তাদের কোনো হানি ঘটে। অপর পক্ষের চাঞ্চল্য—বাঁচবার, অধিকার লাভ করার। তা'রা আসতে চাইছে অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে। চেয়ে দেখো বেদেনী, কোটি কোটি নিরুপায়, উপবাসী, উৎপীড়িত, শৃঙ্খলিত মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে কয়েকটি লোক। পৃথিবীর আড়াইশো কোটি লোকের প্রাণ আড়াই কোটি লোকের হাতে। প্রতিকার নেই কি?

শান্তির পথে কি নেই তা'র প্রতিকার ?

না, তা'র প্রতিকার হোলো হিংসায়, রক্তে, বিপ্লবে! যুগে যুগে এই প্রতিকার হয়ে এসেছে, বেদিনী! এই প্রতিকার হয়েছে তোমার রামায়ণে, তোমার মহাভারতে! এই প্রতিকার পৃথিবীর সকল মহাকাব্যে! তুমি জেনে রাখো, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে মহাকাল—সে এক এক কল্পে গা ঝাড়া দেয়। সে আনে সর্বনাশা প্রলয়, সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাস, সে আনে মানবলোকে মহামরণ! তারপর আবার সে নতুন সৃষ্টির ধ্যানে বসে।

তপতী বললে, তুমি মানো তাঁকে ?

তোমার ভাষায় মানিনে, আমার বুদ্ধিতে মানি ?

বায়ুবেগে এতক্ষণ ডাকগাড়ী ছুটে চলছিল। তা'র গতি ক্রমে মন্থর হয়ে এলো। গাড়ী এসে দাঁড়ালো একটা বড় রকমের জংশন স্টেশনে। তপতী বললে, ওঠো, এইখানে নামতে হবে।

মালপত্র এমন কিছু বেশী নয়। দুইজন কুলী এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। দুজন নেমে এলো।

তপতী এগিয়ে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকলো এবং তার ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে কি যেন বা'র ক'রে দেখালো। স্টেশন মাস্টার শশব্যস্তে রেলওয়ে পুলিশের অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার হেপাজতে তপতী ও অভিমন্যু এক সময় বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখা

গেল তাদের জন্য মোটর প্রস্তুত। আশে পাশে সবাই যেন তটস্থ।

সার্কিট হাউসের সুন্দর বাংলোয় তা'রা যখন এসে পৌঁছলো, দেখা গেল খানসামা তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাগানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অভিমন্যুর দীর্ঘ দীপ্যমান চেহারা দেখে সে-লোকটা আগেই সেলাম জানালো।

তপতী হাসিমুখে বললে, নিতান্ত অসংসঙ্গে পড়োনি, কি বল?

হেসে অভিমন্যু বললে, তোমার মতলবটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

সার্কিট হাউসের মস্ত বারান্দায় ছোটখাটো একটা সভার আয়োজন হোলো। কয়েকখানা বেতের চেয়ার, টেবিল, কিছু লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি গুছিয়ে রেখে খানসামা আহারাদির বন্দোবস্ত করলো। তপতীর কাজ এখানে কম নয়।

কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় পুলিশের কর্তা এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন আরো কয়েকজন অফিসার। তপতী গিয়ে বসলো তাঁদের মাঝখানে। তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় কাটালো কিছুক্ষণ। তাঁরা কি যেন কাগজপত্র দিয়ে গেলেন তপতীর হাতে।

তাঁরা যাবার পর এলো স্থানীয় লোকের এক ডেপুটেশন্।

তার মধ্যে ছিল এখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পূর্ত বিভাগের কর্তা, ফসল-সংগ্রহের কর্মচারী, সেচ বিভাগের লোক, এখানকার জমিদার, আইনজীবী সংসদের সভাপতি, —তাঁদের নানাবিধ আরজি তপতীকে শুনে যেতে হোলো। কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোক এদিকে এসে কৃষকপ্রজা ও শ্রমিক মহলে নানাপ্রকার উস্কানি দিয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জনসাধারণকে প্ররোচিত করছে,—তাদেরও কাহিনী তাকে শান্তভাবে শুনে যেতে হোলো।

তাঁদের পর এলেন মহকুমা হাকিম, এলেন সবজজ, এলেন মুন্‌সিফ, এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন হোমরা চোমরা লোক। তাঁদের ছিল অনেক কথা, অনেক প্রকার অভিমান ও অভিযোগ। তপতীকে অনেকক্ষণ অবধি ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করতে হোলো। তা'র মোট কথাটা হোলো এই, ইংরেজ আমলে এত নালিশ জানাতে আপনাদের সাহস ছিল না, কেননা সাহেবদের উচ্ছিষ্টলাভ ক'রে আপনারা ধন্য হতেন। আপনারা তাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে হুকুম মানতেন, এবং মজুরি হাতে পেয়ে সেলাম ঠুকে বাড়ী যেতেন। না ছিল আপনাদের মৌলিক চিন্তাধারা, না ছিল নিজেদের সুবিধার জন্য কোনো মৌলিক পরিকল্পনা। কায়মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন সাহেবদের বুটজুতোর তলায়। আজ দেশের নেতারা স্বাধীনতা এনে কী অন্যায় করেছেন! নিজের কথা নিজে ভাবতে হবে, নতুন কাজের

সৃষ্টি করতে হবে, নতুন শিক্ষানীতি তৈরী করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে,—এ আপনাদের মস্ত বিপদ! ভাত-কাপড়ের অভাব দেখিয়ে নেতাদের নিন্দা করতে পারলে আপনারা ভারী খুশি! কোনো একটা ছুতো পেলেই হোলো, কিছু একটা উপলক্ষ্য,—অমনি আপনাদের বৈঠকখানা সরগরম হয়ে উঠলো নেতৃ-নিন্দায়। জানেন না কাজের কথা ভাবতে, জানেন না নতুন জীবন গড়তে, জানেন না কিছু একটা ভালো নতুন শিক্ষা দিতে। ভাত খাওয়াতো ইংরেজ, কাপড় এনে পরাতো ইংরেজ, লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতো ইংরেজ, চাকরি দিয়ে ঘরকন্নার ব্যবস্থা ক'রে দিত ইংরেজ। এ ছাড়া রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, জলের জাহাজ, কলকব্জা—সবই ত' ইংরেজের আনা! এ হেন বন্ধু আজ সরে গেল চোখের সামনে থেকে। কী অন্যায় দেশী নেতাদের! মস্ত ভুল করেছেন তাঁরা স্বাধীনতা এনে,—আপনারা কথায় কথায় তাঁদের সমালোচনা করেন। তাঁরা রাষ্ট্রপরিচালনার অযোগ্য, শাসন ব্যবস্থায় অপটু, দেশরক্ষায় অক্ষম, অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধানে অসমর্থ। স্বাধীনতা যেন তাঁদেরই কয়েকজনের স্বার্থ, এতে আপনাদের যেন কোনো আকর্ষণই নেই! নেতাদের যেন উচিত এখন আপনাদের ঘরে-ঘরে এসে আপনাদের পায়ে ধরে মান ভাঙানো, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের দিকে মুখ তুলে চান্, দয়া ক'রে তাঁদের কান ম'লে দিয়ে তাঁদের ভুল শুধরে দিন্, কৃপা ক'রে এই নবলব্ধ

স্বাধীনতাকে রক্ষা করুন, এবং এই যে শিশুরাষ্ট্র কাতরচক্ষে আপনাদের দিকে চেয়ে রয়েছে, একে অসীম অনুগ্রহে কোলে তুলে নিন্। নেতারা ভুল করেছেন ইংরেজকে তাড়িয়ে, অন্যায় করেছেন দেশের মুক্তি এনে—কথায় কথায় চাবুক মেরে আপনারা তাঁদেরকে শাস্তি দিন্! গ্রামের কাজ করবেন, কী বদান্যতা আপনাদের! দেশের উন্নতির কথা ভাববেন—কী দয়া! ঘর গোছাবেন, ফসল ফলাবেন, সম্পদ্ বৃদ্ধি করবেন, শিক্ষা দেবেন, জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী করবেন,—আপনাদের কী অসীম অনুগ্রহ! কয়েক বছর ধ'রে আপনারা ভেবে এসেছেন, স্বাধীনতা পেলে মন্দ হয় না, বেশ মজা পাওয়া যাবে! কিন্তু সত্যি স্বাধীনতা পাওয়া যাবে—কে ভেবেছিল! কাজ করতে হবে, ভাবতে হবে, ছুটোছুটি করতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে,—এ আবার কী উৎপাত! বেশ ত ছিলুম বিলেতী বুদ্ধির আওতায়, দিব্যি কাটছিল ইংরেজের ব্যবস্থাপনায়,—ওরা সব কাজ ক'রে দিত আমাদের! আর কিছু নয়,—আইনকানুনগুলো মেনে চললেই ওরা খুশি, আমরাও নিশ্চিন্ত। চোখটি বুজে থাকতুম, এতটুকু ভয়ভাবনা ছিল না, ভাত-কাপড় পেতুম অনায়াসে। তিরিশ টাকা মাইনে পেলে ঘর চলতো, পঞ্চাশ টাকায় সংসার চলতো। তিনটাকা চালের মণ, দুটাকা মণ গমের, দু'টাকায় তিনখানা ধুতি, টাকায় চারসের খাঁটি দুধ। গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, ক্ষেতভরা ফসল,—

ছিলুম চমৎকার। রাজার খাজনাটা শোধ করতে পারলে আর কথা নেই—একেবারে রামরাজ্য। উৎপাত আনলো ওই নেতারা, ওই গান্ধী যত নষ্টের মূল! খোঁচা দিয়ে ইংরেজের বাসা ভাঙ্গলো, আর ইংরেজরা ঘর দুখানা ভাগ ক'রে দিয়ে দুই ভাইয়ের ঘরেই দেশলাইর কাঠি জ্বেলে দিয়ে গেল! সুতরাং আর কি, এসো এবার আগুন নিয়ে খেলা করি, পুড়িয়ে মারি সবাইকে, ঘরগুলো সব ভেঙ্গে দিই, ওলোট পালট করি সব, ব্যবস্থা উল্‌টে দিই, আইন কানুন হেসে ওড়াই,—এখন আর কে কা'কে মানে! নেতারা এতকাল সত্য-অহিংসা ক'রে এসেছে,—ওরা কি আর ইংরেজের মতন কঠোর হবে? কামান-বন্দুক গোরা-পাহারা নিয়ে কি আর ঠেঙ্গাতে আসবে আমাদের? এখন আর ভয় কি? পরোয়া কি? ওদের জব্দ করো, হায়রাণ করো, নাকখৎ দেওয়াও, পাগল সাজাও, গালি দাও, নীচে নামাও, চোর বানাও,—ওরা কিচ্ছু বলবে না! ওরা যে সত্য-অহিংসা ক'রে এসেছে এতকাল!

তপতী এবার অগ্নির ঝলকের মতো হেসে থেমে গেল! পাশের ঘরে ব'সে খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধ'রে অভিমন্যু কান পেতে তপতীর বাগ্মিতার তারিফ করলো বৈ কি। একটু পরেই বুঝতে পারা গেল, কিছু কাগজপত্র দিয়ে, কিছু আবেদন আর নিবেদনের পালা সেরে ভদ্রলোক-গুলি সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহিলার অনর্গল

বাক্যস্রোতের বিরুদ্ধে উজান ঠেলে নৌকা বায়, সাধ্য কি পুরুষের! লোকগুলি এবার পালিয়ে বাঁচলো। পুলিশের কর্তা মহাশয় তপতীর অভিভাষণে পরিতুষ্ট হয়ে করমর্দন ও নমস্কার জানিয়ে গা ঢাকা দিলেন। এবার তাঁর পদোন্নতি অনিবার্য।

তপতী ফিরে এলো এঘরে, এবং আচম্বিতে অভিমন্যুর মাথার একমুঠি চুল ধ'রে নাড়া দিয়ে তা'র মনের স্ফূর্তি প্রকাশ ক'রে বসলো। অভিমন্যু হেসে বললে, আমার চুলে যদি কোনোদিন পাক ধরে, তোমার বক্তৃতার তেজ কমে যাবে, বেদেনী!

তপতী ছুটে গিয়েছিল জানলার ধারে, ছুটে গেল এবার দেয়ালের কাছে আয়নার সামনে। এবার তা'র শুকনো এলো খোঁপা আলগা হয়ে নেমেছে পিঠের দিকে,—মুখখানা রক্তাভ হয়েছে বক্তৃতার উত্তেজনায়। ওখান থেকেই সে জবাব দিল, কেন? কেন?

অভিমন্যু বললে, তুমি বুঝবে তোমারও বয়স বেড়েছে। বয়স হোলো অনেক বড় সম্বল মেয়েদের,—এটা তাদের সকল কাজের উদ্দীপনা।

তপতী সাবলীল আনন্দে এগিয়ে এলো। তারপর দুই হাতে অভিমন্যুর মুখখানা ধ'রে বললে, অমৃতফল কাঁচা অবস্থায় ভয়ানক তেজী, কিন্তু পাকলে বড় মধুর। যৌবন কি শুধু শরীরের মাংসের কঠিন বাঁধন, শুধু কি মাংস-

পেশীর তেজস্বিতা, শুধু কি শিরা-উপশিরা অন্ত্রতন্ত্রের শক্তগ্রন্থী ? বয়স যাদের কম, তারা জানে না যৌবন হোলো মানসিক। তোমার চুলে পাক ধরলে আমার প্রাণের মূল হবে আরো দৃঢ়, শিকড় নামবে অনেক নীচে। আমার গাছটা কলমের নয় অভি, যে, হঠাৎ ডালটা বসিয়ে আগামী কাল ফল ফলানো! এ গাছ হয়ে উঠেছে বীজ থেকে অঙ্কুরে, এর প্রতি শাখা-প্রশাখা পত্রপল্লব তিলে তিলে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে সূর্যের প্রাণরশ্মি পান করে। আমার পরিপূর্ণতাব তুমি উপলক্ষ্য !

ধরো—অভিমন্যু বললে, আমার যদি মৃত্যু ঘটে ?

তপতী বললে, তোমাকে অমৃতময় ক'রে তুলবো।

ধরো, যদি রাজনীতিক কারণে কেউ আমাকে খুন ক'রে বসে ?

তপতী হেসে জবাব দিল, সেই রক্তের তিলক তুলে নেবো আমার সিঁথির মূলে,—সেই হবে সধবার সিঁদুর।

অভিমন্যু বললে, আচ্ছা বেদেনি, সেই পুরনো কথাটাই আবার জিজ্ঞেস করি। তুমি সিঁদুর মুছে ফেললে কেন ?

তপতী বললে, তুমি ধর্মদ্বেষী, রাজদ্রোহী, সমাজশত্রু,— তোমার মুখে এই হিঁদুয়ানি কেন বলো ত ? এ লালসা কেন ?

ছেলেমানুষী কৌতূহল !

তপতী বললে, তোমার সঙ্গে বিয়েটা স্বীকার করিনে।

আমাদের বিয়ের কথা কেউ জানে ?

জানে দু'জন—তুমি আর আমি। স্বীকার করে না দু'জন—সেও তুমি আর আমি।

অভিমন্যু বললে, আমি স্বীকার করিনে কে বললে?

তপতী বললে, তোমার জীবনের আদর্শ বন্ধনকে স্বীকার না করা; আমার জীবনের আদর্শ মিথ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা!

তুমি কি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছ?

তপতী হেসে ফেললো। বললে, ওরে মূঢ় পুরুষ, দূরে রেখেছি আজ, কিন্তু কাছে টানবো যেদিন,—সকল আদর্শের সমস্ত মূল একে একে নিজের হাতে ছিঁড়ে উন্মত্তের মতন ছুটে আসবে তুমি। এ আকর্ষণ হোলো সর্বকাল-বিজয়িনী শক্তির, করালী কালরূপিনীর! তুমি কে? সামান্য শিশু তুমি! জন্ম তোমার নারীর গর্ভে। একটি বীজাণুর থেকে সে তোমাকে দিয়েছে আকার, দেহ, মূর্তি, প্রাণ, তুমি শুধু নিয়তির নিরুপায় ক্রীড়নক। তোমার পিছনে রয়েছেন ইচ্ছাময়ী মহাকালী! তুমি নগণ্য মানবক,—অবোধ, অজ্ঞ, অন্ধ অর্বাচীন শিশু। চেয়ে দেখো পলকে পলকে সেই ভয়ভীষণা মহাকালীর থেকে নিঃস্রাবিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ, পলকে পলকে ধাবিত হচ্ছে আবার সেই করালরূপিনী সংহারকারিনীর সর্বগ্রাসের গূঢ় গুহায়! তুমি কে? তুমি কেউ নয়! আমি সেও শক্তি! আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তোমার জীবন-মরণ বাঁধা!

অভিমন্যু সহাস্যে হাততালি দিয়ে বললে, বুঝতে পারা গেল আমি তোমার পাশে থেকেও কাছে নেই!

তপতী বললে, কিন্তু দূরে গেলেও আবার ঘুরে আসো কেন বলো ত?

আসি অনেকটা নিজের খুশিতে!

ভুল। তপতী বললে, তোমার খুশিতে নয়, আমার ইচ্ছাই তোমাকে আনে। সম্পর্কটা ঠিক স্বামীস্ত্রীর নয়, ইস্পাতের আর চুম্বকের। চন্দ্রের আর জলতরঙ্গের।

উৎকৃষ্ট আলোচনার দিকে ওরা এগিয়ে চলেছে, এমন সময় হতভাগ্য খানসামা খবর দিল, আহারাদির সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত।

পাশের ঘরে গিয়ে খাবার টেব্‌লে ব'সে অভিমন্যু বললে, তোমার এই দেখাসাক্ষাতের পালা আর কতক্ষণ চলবে?

তপতী বললে, এই হোলো আমার চাকরি। নিজের খুশিতে যখন যেখানে হোক ঘুরে বেড়াবো, খরচ লাগবে না কিছু। দেখে বেড়াবো, লোকের কথা শুনবো,—সুবিধামতো সেইগুলোর বিবরণ পাঠাবো। স্বাধীন বলেই চাকরিটে গায়ে লাগে না।

বেতনের পরিমাণ?

তপতী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, ওটা ঠিক আমি নিজেই জানিনে। টাকার দরকার হ'লেই লিখে

পাঠাই, কিম্বা কমল আমার চিঠি নিয়ে যায়, টাকা আনে। সম্প্রতি কমলের হাতেই আমার জীবনযাত্রার দায়িত্ব!

অভিমন্যু বললে, দেখা যাচ্ছে সুশ্রী মেয়েরা দিল্লীর কাছ থেকে আজকাল অনেক সুবিধা পায়। কিন্তু এখানে তোমাকে ক'দিন থাকতে হবে?

ক'দিন! এখনই যাবো এখান থেকে! পরের ট্রেনে।

লক্ষ্ণৌ ফিরবে কবে?

যেদিন যখন খুশি। পিছনে কিচ্ছু রেখে আসিনে, অভি, যার টানে ফিরবো। মোহ রাখিনে কোনো বাসস্থানের। দেশ ভালো লাগে, ঘর ভাল লাগে না। ঘর আমার আসমুদ্র হিমাচল।

অভিমন্যু বললে, অর্থাৎ ভদ্রভাষায় বেদেনী, গ্রাম্য ভাষায় বাউণ্ডুলে!

তপতী বললে, তুমি যেদিন প্রথম আমার নাম দিলে, বেদেনী, মনে হয়েছিল পথ থেকে হীরের টুকরো কুড়িয়ে পেলুম।—হঠাৎ হেসে সে পুনরায় বললে, বলতে কি আমার তটের বাঁধন তুমি সেদিন থেকেই আলগা ক'রে দিয়েছ। হ্যাঁ, তা প্রায় পনেরো বছর হোলো বৈ কি।

অভিমন্যু বললে, আমি তোমার তট আলগা করেছি, কিন্তু তুমি আমার মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছ, তা জানো?

তপতী একটু হেসে একখানি চামচের সাহায্যে সব চেয়ে

ভালো মিষ্টান্নটি তুলে বল্‌লে, তোমার গালের মধ্যে ফেলে দেবো, না পাতের ওপর ?

অভিমন্যু হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বললে, হাতে দাও।

বেশ, হাতেই নাও। কিন্তু এবার থেকে একটু মাধুর্যরসের চর্চা করো দেখি ? মুখখানা তোমার যেমন গম্ভীর তেমনি গোমড়া। যেন সবাইকে শাসন করার জন্য অভিভাবক হয়ে জন্মেছ। ছাড়ো দেখি বদ্‌ অভ্যাস ? একটু দয়া ক'রে প্রাণ খুলে হাসো দেখি ? আমি সাহস দিচ্ছি, হাসলে তোমার একটুও চরিত্র নষ্ট হবে না। লোক হাসাচ্ছ, কিন্তু নিজে হাসছো না।

অভিমন্যু এবার সত্যিই হাসলো।

তপতী বললে, বাঃ তোমার বিষণ্ণ দাঁতগুলি কী সুন্দর !

অভিমন্যু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলো এবার।

আহারাদি সেরে উঠে তপতী অভিমন্যুর পাশে ব'সে বললে, একটা তাম্বুল দেওয়া পান খাবে ?

ছি !

সিগারেট ? তামাক ?

অভিমন্যু বললে, ছুঁইনে !

তপতী ফস ক'রে বললে, আমাকে যদি ছোঁও ?

ভয় করে।

কেন ?

অভিমন্যু বললে, তুমি আগুন।

তপতী প্রশ্ন করলো, এই ত্রিশ বছরের কাছে এসেও?

আগুনের বয়স নেই!

আচ্ছা, তোমাকে দেখলে আমার শিখা কাঁপে কেন বলো ত?

অভিমন্যু বললে, কাঁপলেও তা'র দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে!

তপতী একটু থামলো। পরে বললে, খানসামা গেছে ষ্টেশনের দিকে, সারকিট হাউসে এখন কেউ কোথাও নেই——লোকালয় অনেক দূরে—প্রাণের স্পন্দন শুধু শোনা যায় মধ্যাহ্নের তন্দ্রাতুর পাখীর ক্লান্ত কণ্ঠে। একটু বিশ্রাম করবে এখানে?

অভিমন্যু বললে, বেদেনি, তুমি অনেকবার আমাকে পরীক্ষা করেছ। এখনো কি শেষ হয়নি?

তপতী বললে, কিন্তু পরীক্ষায় বা'র বা'র মার খাওয়াটাই কি পৌরুষের একমাত্র পরিচয়, অভি?

মার খেয়েছি!—অভিমন্যু দীপ্ত চক্ষে তাকালো।

ভেবে দেখো জয় করোনি তুমি কোনোদিন। কিন্তু পরাজয়কে স্বীকারও করোনি। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বা'র বা'র এসেছ তুমি আমাকে নিতে।

তুমি কি আমার সম্মানবোধে আঘাত করতে চাও, বেদেনী?

তপতী চঞ্চল হয়ে বললে, ছি, তুমি ছোট হলে আমি যে যাবো পায়ের তলায়। তা নয়। তুমি আমাকে চাও তা'র

কারণ অন্য। চেয়ে দেখো তোমার কাজের দিকে। তোমার বুদ্ধি, যুক্তি, সাধনা, ত্যাগ, লোকপ্রীতি, রাজনীতিক দর্শন, তোমার আশ্চর্য পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বক্তৃতা,—কোনটা নিতে চায় না দেশ। কেন জানো? সমস্তটার পিছনে হৃদয়াবেগ কম, প্রেমের পরিচয় নেই, প্রাণ প্রতিষ্ঠার অভাব। এদেশ বুদ্ধি, যুক্তি আর পাণ্ডিত্যে ভোলে না, ভোলে যদি থাকে সর্ব-প্লাবী প্রেম, যদি থাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাস। তুমি চাও সেই প্রাণ আমার সাহায্যে ; তোমার আদর্শের হোমাগ্নিকুণ্ড থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমি সকল ঘরে ঘুরবো, এই তোমার স্বপ্ন! কিন্তু এ যে তোমার আত্মাভিমান, একথা বোঝ না কেন? অভি, মতবাদ বড় নয়, বড় হোলো কাজ। আজ তোমরা অনেকে মিলে পথ দেখাতে বসেছ, ফলে পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। আলো জ্বালতে চাইছ, নানালোকের নিশ্বাসে আলো জ্বলছে না কোথাও। মতের পার্থক্য নিয়ে হানাহানি করছো, ফলে মূল্যবান দিনগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কি হবে মত দিয়ে, পথ যদি না পেলুম? আজ কাজের ডাক যখন সত্যই এলো সাত শো বছর পরে, তোমরা জাগিয়ে তুলতে চাইছ কোলাহল। মূঢ় দেশ যখন অসাড় হয়ে রয়েছে জীবনীশক্তির অভাবে, তুমি তখন তরোয়াল নিয়ে আস্ফালন করছ ক্ষমতা আর প্রভুত্বের জন্য।

অভিমন্যু বাধা দিয়ে বললে, ক্ষমতার লোভ আমাদের, না জনসাধারণের?

জনসাধারণ!—তপতী হেসে উঠলো। বললে, এই জনসাধারণ একদিন ইংরেজ সম্রাটের জয়গানে মুখর হোতো, যুদ্ধজয়ী ইংরেজের স্তবগান করেছে তিরিশ বছর আগে। এই জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গের দিনে সুরেন বাঁড়ুয্যে আর রবি ঠাকুরকে মালা পরিয়েছে; কিন্তু এই জনসাধারণই সুরেন বাঁড়ুয্যের ওপর জুতো ছুড়েছিল, এবং রবি ঠাকুরকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে। এই জনসাধারণ গান্ধীজীর ক্যাম্পে আগুন লাগিয়েছিল ঢাকায়, জুতো ছুড়ে মেরেছিল শ্রীরামপুরে। এই জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য মার খেয়েছে এই শতাব্দির প্রতি দশকে; আবার এই জনসাধারণের খেয়াল খুশিকেই তোমরা খুঁচিয়ে তুলছো কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খলায় ভ'রে তুলতে। জনসাধারণের কথা থাক্—ওদের যে-পাত্রে রাখো সেই পাত্রেরই রং ধরে। জনসাধারণের মই বেয়ে উঠে কত নেতা নিজের ঘর গুছিয়ে নেয়। জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি যদি থাকতো দাঁড়াতে পারতে তোমরা? যে-দেশের জনসাধারণের শতকরা নিরানব্বই জন লেখাপড়া জানে—তাদের দিকে তাকাও। তারা গড়েছিল হিটলার-মুসোলিনীকে, তা'রা গড়েছিল চার্চিলকে, তা'রা গড়েছিল রুজভেল্ট আর স্টালিনকে। চেয়ে দেখো, পৃথিবীর সব দেশের জনসাধারণের একই প্রকৃতি। কোনো একটা নীতির ক্রীতদাস বানাও তাদের, তারা খুব খুশি; কোনো একট নীতির বিরুদ্ধে তাদের

বলো, তারা খুব খুশি। হাইড পার্কে দাঁড়িয়ে চার্চিল বলছে, হাত তোলো; ন্যুরেমবর্গে দাঁড়িয়ে হিটলার বলছে, হাত তোলো; রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে স্টালিন বলছে, হাত তোলো; রোমের মাঠে দাঁড়িয়ে মুসোলিনী বলছে, হাত তোলো; নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে ট্রুমান বলছে, হাত তোলো! সমস্ত ইউরোপ আর আমেরিকা কথায় কথায় হাত তুলছে! পৃথিবীর সর্বত্রই এই,—হাত তোলার হুজুগ! এর নাম জনসাধারণ, এরই নাম গণতন্ত্র। আসল কথা হাত তুলতে শেখানো, কোনোমতে সংখ্যা বাড়ানো। বুদ্ধিবিচারের কথা থাক্, থাক্ মনুষ্যত্বের কথা, থাক্ আত্মিক শক্তির কথা,—তোমরা চাও সংখ্যা, তোমরা চাও অগণ্য উঁচু হাত, —কেননা সেই হাত ভ'রে তোমরা দিতে চাও একটা মতবাদ। অমৃত নয়, দেবত্ব নয়, আনন্দ নয় আশীর্বাদ নয়, —একটা রুক্ষ নীরস মতবাদ, যেটা নিয়ে তাদের প্রাণলোকের কোনো পরিতৃপ্তি ঘটে না। কিন্তু একমাত্র এই ভারতবর্ষ— যেখানে গান্ধীজী হাত তোলাতে চাননি, মতবাদ আরোপ করতে চাননি! তিনি বলেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। তিনি বলেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তিনি এদেশের মাটির অনেক নীচে, গূঢ় অন্ধ অতলে। সূর্যরশ্মি যেমন মৃত্তিকাকে প্রসবিনী করে, বীজকে যেমন করে অঙ্কুরিত, বৃক্ষকে করে ফলবান।—

অভিমন্যু বললে, বেদেনি, কান পেতে শুনছি তোমার

কথা। তুমি নানা কথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিন্তু আসল কথা-টায় কিছুতেই এসে পৌঁছচ্ছ না। আজ সত্যিকার মার খাচ্ছে কে? কাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গছে! কা'রা পঙ্গু হচ্ছে?

তপতী বললে, গাছ পোঁতে একজন কিম্বা দুজন, কিন্তু ফল খায় সকলে। বিষবৃক্ষ রোপণ করেছ তোমরা এক-দিন, আজ তারই ফল খেয়ে তোমার ওই জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজ ও সভ্যতা আজ যে ভয়ানক সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা হোলো প্রধানত নৈতিক আর আত্মিক। সন্দেহ নেই, এটা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। বিবর্তনবাদের নিয়মে আমরা এক কল্প থেকে অন্য কল্পে অতিক্রম ক'রে চলেছি। একদিকে ভয়, সংশয়, বিরোধ এবং ধ্বংসের ইঙ্গিত, অন্য দিকে মানুষের আনন্দলাভের পিপাসা এবং দেবত্বময় জীবনের জন্য মর্মান্তিক আকুলি বিকুলি। তোমার জনসাধারণ কোনোকালেই চায় না যুদ্ধ, অশান্তি, বিদ্বেষ এবং ক্ষমতালাভের জন্য হানাহানি। তা'রা চায় আনন্দ, শান্তি, অমৃতের আস্বাদ, তা'রা চায় চিত্তলোকের বন্ধনহীন মুক্তি।

অভিমন্যু রুষ্টকণ্ঠে বললে, কিন্তু তাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা? তোমার ইংরেজি আর ইয়াঙ্কি গণতন্ত্র সেই সমস্যা মেটাবে কি?

কেউ মেটাতে পারবে না অভি,—তপতী বললে, মিটবে নিজের থেকে, নীচের থেকে। জনসাধারণ নয়, গণতন্ত্র নয়, সমস্যা মেটাবেন স্বয়ং গণদেবতা। সেই মহাজনদেবতা জপে

ব'সে রয়েছেন, তিনিই দেখাবেন পথ। বিজ্ঞান ছিল না আগে ছিল না তোমার সাধারণ তন্ত্র, কিন্তু চিরকাল ধরে ছিল ওই মহাজনগণ! কে মিটিয়েছে এতকাল ধ'রে তাদের সমস্যা? তা'রা যুগ যুগান্তর ধ'রে কাজ করেছে, সৃষ্টি করেছে, কীর্তি-স্তম্ভ গড়েছে কালে কালে,—কিন্তু যাবার সময় নিজের স্বাক্ষর মুছে দিয়ে গেছে, কোথাও রেখে যায়নি তাদের পায়ের চিহ্ন। অহমিকা প্রকাশ ক'রে বলো না জনসাধারণ, শ্রদ্ধার সঙ্গে সবিনয়ে বলো, গণনারায়ণ। তাঁর জন্য তোমাদের লড়াই করতে হবে না, তিনিই তোমাদের পথ দেখাবেন। কাঙ্গালী ভোজন করিয়ে বলো না জনসাধারণের কল্যাণ,—গণদেবতার নৈবেদ্য সাজাও, তারপর মাথা নত ক'রে প্রসাদ গ্রহণ করো।

হঠাৎ তপতী থামলো। সারকিট্ হাউসের ফটক পেরিয়ে একখানা মোটর এসে ভিতরে ঢুকলো। মনে ছিল না, ইতিমধ্যেই বেলা গড়িয়ে এসেছে। তপতী হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, এবার ওঠো।

অভিমন্যু বললে, আবার ট্রেন? এবার কোন্ চুলোয়?

হাসি মুখে তপতী বললে, কথা বলো না, অনুসরণ করো।

আমাকে আট্‌কে রাখছ কেন তুমি? কলকাতায় যে আমার অনেক কাজ!

কী এমন রাজকার্য শুনি?

অভিমন্যু বললে, তুমি কি কিছু জানো না?

ঘরের মাঝখানে পর্দা টেনে দিয়ে তপতী পাশের ঘরে ঢুকলো। চক্ষের পলকে পোর্ট্‌ম্যাণ্টো থেকে শাড়ী বের ক'রে জড়াতে লেগে গেল। তারপর হাসিমুখে গলা উঁচু ক'রে বললে, কাজ ত' ওই,—১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল বা'র করবো, পট্‌কা তৈরী করবো, য়্যাসিড্‌ বাল্‌ব্‌ বানাবো, গাঁয়ে গিয়ে চাষা ক্ষেপাবো, দেশী পাইপে বন্দুক তৈরী করবো—কিচ্ছু না পারি, ইস্কুল কলেজের ছেলেদের পড়াশুনোটা অন্তত নষ্ট ক'রে দেবো—এই ত' কাজ তোমার? ও-কাজগুলো যখন খুশি পারবে,—আপাতত দু চারদিন সৎসঙ্গে বাস করো দেখি?

এঘর থেকে হাসিমুখে অভিমন্যু বললে, তোমার সঙ্গটা কি খুব সৎ?

সৎ না হোক সরস ত' বটে!—বলতে বলতে তপতী ওঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, খুব হয়েছে, চলো এবার।

ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে তপতী আগে আগে গিয়ে মোটরে উঠলো। মোটরের পিছন দিকের খোপরে জিনিসপত্রগুলো খানসামা ভ'রে দিল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তপতী খান দুই দশ টাকার নোট খানসামাকে বকশিস করলো।

গাড়ী ছাড়বার পর অভিমন্যু বললে, এবার সত্যিই আমাকে ছুটি দাও বেদেনী।

কেন?

আমার ছাত্র দুজনের পড়া হচ্ছে না, তাদের পরীক্ষা সামনে।

তপতী প্রশ্ন করলো, কত টাকা পাও পড়িয়ে ?

অভিমন্যু বললে, পাই একশো টাকা। কিন্তু তিরিশ টাকা রেখে বাকি দিই পার্টিফণ্ডে।

তিরিশ টাকায় চলে ?

চালাতেই হয় !

তপতী চুপ ক'রে রইলো। অভিমন্যুর কণ্ঠে কোথায় একটি সূক্ষ্ম কারুণ্য তার কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত করলো সেই জানে। কিছু একটা বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে তার কথা ফুটলো না।

মোটর ছুটে চলেছে। আসবার সময় তা'রা যে-পথ দিয়ে এসেছিল, এটা সে-পথ নয়। গাড়ীর চাকার তাড়নায় ধুলি-সমাচ্ছন্ন পথটা পিছনের দিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ডান-দিকে স্টেশন রেখে গাড়ী সোজা চললো পশ্চিমে।

অভিমন্যু প্রশ্ন করলো, ট্রেন ধরবে না ?

তপতী আত্মবিস্মৃতভাবে তা'র দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালো, কোনো একটা জবাবও দিল না। বুঝতে বিলম্ব হোলো না, তা'র চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। অভিমন্যু চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

গাড়ী বাঁক নিল মাঠের মধ্যে। সরু পাকা রাস্তা সোজা চ'লে গেছে কোন্ দিকে ঠাহর করা যায় না। হেমন্তের রাঙ্গা আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে।

তপতী এক সময় একটু সজাগ হয়ে বললে, স্থলোচনার ননদের বাড়ীতে এখনো খাচ্ছ ত ?

অভিমন্যু বললে, সেখানে যাওয়া বহুদিন ত্যাগ করেছি !

কেন ?

ওদের বাড়ীর দুটি ছেলেমেয়ে আমাদের পার্টির কাজ ক'রে দেয়, এই নিয়ে ওদের সঙ্গে একদিন আমার তর্ক হয়। সেই থেকে আমি আর যাইনে।

ছেলেমেয়ে দুটি ?

তাদের নিয়ে নানা অশান্তি নাকি দেখা দিয়েছে শুনি।

তপতী এবার মুখ ফিরিয়ে বললে, নিজের স্বাস্থ্য কিভাবে তুমি নষ্ট করছো, দেখেছ ? তিরিশ টাকায় কী খাও তুমি বলোত ?

অভিমন্যু বললে, যা এদেশে সবাই খায় তাই ?

এভাবে কতদিন চলবে ?

যাবৎ চন্দ্র-দিবাকরৌ !

তপতী বললে, উন্নতি করবে না নিজের ?

অভিমন্যু হাসিমুখে তা'র প্রতি তাকালো। বললে, উন্নতি মানে ? রোজগার বাড়াবো, না টাকা জমাবো ?

জমাতে আমি বলিনে !

রোজগার বাড়ালেও ত' আমার ভাগে সেই তিরিশ !

তপতী বললে, এই কি তোমাদের দলের নিয়ম ?

অভিমন্যু বললে, নিয়ম নয় নির্দেশ। আমার উপার্জনের উপর তাদের অধিকার,—তাদের কাছে পাই ওই তিরিশ!

তপতী বললে, আমার কাছে কিছু টাকা নেবে তুমি?

টাকা! কেন?

আমি যদি তোমার জন্য একটু ভালো খাওয়া, আর ভালো থাকার বন্দোবস্ত করি?

অভিমন্যু সহাস্যে বললে, ভিক্ষে দেবে?

তপতী বললে, মন্দ কি? ভোলানাথ ভিক্ষার ঝুলি পেতেছেন অন্নপূর্ণার কাছে,—এতে লজ্জার কিছু নেই!

অভিমন্যু বললে, তপতী, আমাদের চক্ষুলজ্জা বড়ই কম। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যে কোনো গর্হিত কাজ আমরা হাসিমুখে করতে পারি! তোমাদের চল্‌তি সমাজনীতি যেটাকে মন্দ বলে, আমরা অনেক সময় সেটাকে মন্দ বলিনে। উঁচু নীচুর জ্ঞান আমাদের কম। আমাদের কাজের পুরোভাগে অনেক সময় থাকে দাগী চোর, গাঁটকাটা, জুয়াড়ী, স্বভাব দুর্বৃত্ত এবং অনেক রকমের মেয়ে পুরুষ,—যাদের নাম সমাজের আবর্জনা। তা'রা-যে অবস্থার দাস—একথা আমাদের কাছে এসে তা'রা জানতে পারে, আমরা তাদের আসন দিই। তাদের চাপা আক্রোশ আর বিদ্বেষ আমাদের অনেক কাজে লাগে।

তপতী বললে, অর্থাৎ নীচের নোংরাটা ওপরে ঘুলিয়ে তোলো।

অভিমন্যু বললে, এরা শক্তি, এই কথাটা আগে বুঝতে হবে। এরা মনুষ্যত্বের ধার ধারে না, কিন্তু এরা কাজ করে। এরা থাকে তলায়, কিন্তু এরাই হোলো বনেদ। এরা যদি মাথা চাড়া দেয়, ওপরতলাটা ভেঙ্গে পড়ে—এটা স্বতঃসিদ্ধ। এরা সকল জাতি, সকল সমাজ আর সকল স্তরের বাইরে। এরা বর্বর, কিন্তু এরাই শ্রমিক। এরা থাকে নগরের আনাচে কানাচে, সুড়ঙ্গে, বস্তিতে, কলকারখানায়, জাহাজের খোলে, নদীর তীরে-তীরে। এদের জাতিগোত্র পরিচয় নেই, জন্ম-মৃত্যুর ঠিকানা নেই, কোনো সমাজে এদের স্বীকৃতি নেই—এরা চিরকাল ধ'রে নগরে, সাগরে, মাঠে, মোহানায় ভেসে বেড়ায়। এ যুগে আমরাই ওদের প্রথম কুড়িয়ে নিয়েছি,—তাই ওরা আমাদের সকল কাজের অনুগামী। কোনো মানুষ মন্দ নয়, এই কথাটা ওরা আমাদের মুখ থেকে শুনতে পায়। ফলে, ওদের অন্তর্নিহিত মানবতা সাড়া দিয়ে ওঠে।

তপতী চুপ ক'রে শুনছিল।

অভিমন্যু বললে, ওরা বর্বর, ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে দেখেছ ওদের অমানুষিক বর্বরতা। আর্য অনার্য শক হূণ গ্রীক পাঠান মোগল, এমন কি সেদিনের পোর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ইংরেজ—সবাই সৃষ্টি ক'রে গেছে ওদের যুগে যুগে কালে কালে। ফিরে তাকায়নি কেউ ওদের দিকে, কেউ রেখে যায়নি স্নেহ ওদের জন্যে,—বংশ পরম্পরায় ওরা নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন বালুর দানা! ওদের বাদ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতা, সভ্যসমাজ,

সভ্য নরনারী। শিক্ষার যুগ এসেছে, এসেছে সংস্কৃতি, লেখা হয়েছে মহাকাব্য আর ইতিহাস,—কিন্তু ওরা নেই তার মধ্যে। কালক্রমে ওরা গিয়ে মিশেছে তুমি যাদের বলো মহাজনগণ,—তাদের সঙ্গে। তা'রা মাঠে ধান কাটে, বীজ বোনে, কল চালায়, ইঞ্জিন ঘোরায়, ঘর বানায়। তোমার অন্ন, বস্ত্র, বিলাস, ব্যসন, বাহন,—তোমার জীবনযাত্রার যা কিছু সামগ্রী সমস্তগুলো তাদের রচনা। কিন্তু তাদের চেনো কি? প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিস যাদের হাত থেকে পাও, জানো কি তাদের? কৃতজ্ঞতা বোধ করো কি তাদের কাছে? খবর রাখো কি, তাদের অন্নবস্ত্র জোটে না, তাদের ফুটো চালায় জল পড়ে, শীতের আবরণ নেই, ব্যাধির প্রতিকার নেই,—তা'রা মড়কে আর দুর্ভিক্ষে প্রথম প্রাণবলি দেয়? একথা কি জেনেছ, তা'রা চিরকাল মার খায় ধনী ব্যবসায়ী আর ঠিকাদারের হাতে? ভেবেছ কখনো তাদের সন্তানসন্ততি কী খেয়ে মানুষ হয়? খবর কি রেখেছ, অভাবের তাড়নায় তাদের অনেক পুরুষ যায় জুয়াচুরির পথে, আর মেয়েরা খুলে বসে পতিতালয়?

মোটর চলেছে হু হু শব্দে মাঠের মাঝখান দিয়ে। ইতিমধ্যে শীতের হাওয়ায় তপতী যে কখন পায়ের নীচেকার নরম কম্বলখানা অভিমন্যুর কোলের উপরে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, বক্তৃতার আবেগে অভিমন্যু নিজেও তা লক্ষ্য করেনি। ড্রাইভার ছিল ভিন্ন ভাষাভাষী, ওদের পরিশুদ্ধ বঙ্গভাষা তা'র পক্ষে বোধগম্য ছিল না—এতক্ষণ নিরুদ্বেগে সে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

অভিমন্যু থামলো, থেমে এক সময় পুনরায় বললে, টাকা দিলে হাত পেতে নেবো না, এমন বিষয়-বিরাগী আমি নই। কিন্তু টাকা আমি চাই না তপতী, আমি চাই তোমায়!

তপতী বললে, আমাকে ত' পেয়েছ!

মিথ্যে বলো না, স্তোকবাক্য শুনিয়ো না। তোমাকে কোনোদিন পাবার আশাও দূরে যাচ্ছে।

হঠাৎ তপতী হাসলো। বললে, আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলুম বলো ত?

অভিমন্যু বললে, হয়ত ভাবছিলে তিরিশ টাকা দামের এই গ্রামোফোনটা অনেক আবোল তাবোল গেয়ে চলেছে।

না—তপতী বললে, ভাবছিলুম মনে মনে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।

তবে কেন তুমি আমার কথা শুনবে না?

তপতী বললে, আগে আমার কথা তুমি শুনবে বলো?

অভিমন্যু বললে, অবাধ্য হয়েছি কোনোদিন?

চিরদিন!

অভিমন্যু চুপ ক'রে গেল। তপতী বললে, দেশের দুঃখ তোমার হাতে ঘুচবে, এই আত্মাভিমান আগে ত্যাগ করো। আগে স্বীকার করো তুমি যন্ত্র, যন্ত্রী নও। স্বীকার করো তুমি সেবক, অভিভাবক নও। স্বীকার করো আক্রোশের চেয়ে বড় আনন্দ, বিদ্বেষের চেয়ে বড় প্রেম! স্বীকার করো ক্ষমতার চেয়ে বড় মমতা!

অভিমন্যু এবারও কোনো জবাব দিতে পারলো না।

মোটর এসে ঢুকলো কোন এক গ্রামে। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ পেয়ে গ্রামের হিন্দুস্থানী বালক বালিকারা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। এপাশে আখের মরাই, ওপাশে গোয়ালপাড়া। গাড়ীখানা ক্রমে গ্রামের অপর প্রান্তে এসে একখানা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। সম্মুখের বড় দেওয়ালে রংকরা এক মস্ত গন্ধমাদনধারী হনুমানের ছবি আঁকা। তা'র ল্যাজের ডগাটা উঠে গেছে প্রায় বাড়ীর দোতালার কাছাকাছি—যে অংশটায় স্থানীয় জমিদারের কাছারি।

তপতী বললে, এর আগেও একবার এসেছি এখানে। পথটা চেনা।

অভিমন্যু বললে, এখানে কি দরকার ?

ইনি রামজীবন ত্রিবেদী—জমিদার। লোকটা ভারি ভোগাচ্ছে গভর্ণমেণ্টকে একখানা তালুক নিয়ে। আমি এসেছি এবার কিছু কড়া কথা শোনাতে। বলবো পরে সব কথা

তপতী নামবার আগে পুনরায় বললে, এরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে, তুমি সেখানে অপেক্ষা করো—আমি আসছি!—এই ব'লে সে ভিতরে ঢুকলো। অভিমন্যু গলা বাড়িয়ে দেখলো তপতীকে অভ্যর্থনা করার জন্য কয়েক-জন প্রতিনিধিস্থানীয় লোক ইতিমধ্যে তটস্থ হয়ে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে।

অভিমন্যুকে নিয়ে গাড়ীখানা এগিয়ে অন্য এক পথে চললো। গাড়ীখানা পুলিশের কর্তার, বলাই বাহুল্য। কিছুদূর গিয়ে মস্ত এক নহবৎখানার তলা দিয়ে মোটর এসে দাঁড়ালো এক ফুলবাগানের ধারে। সামনেই হাল আমলের একখানা বাংলা—এটি নাকি জমিদারের অতিথি-শালা। নহবৎখানার পাশে একটি ঘণ্টাঘড়ি ঝুলছে। অভিমন্যু গাড়ী থেকে নেমে বাংলার বাবান্দায় উঠে দাঁড়া-তেই কে যেন গিয়ে ঘণ্টাঘড়িতে ছয়টা বাজিয়ে গেল। ক্রমে সেই ঘড়ির ঘণ্টারব মিলিয়ে গেল গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের দিকে। তারপরে আরম্ভ হোল কোথায় শিবের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা।

অভিমন্যুর ভালোই লাগছে। একখানা চেয়ার টেনে বসলো সে বাংলার বারান্দায়। হুকুমের অপেক্ষায় একটি লোক করজোড়ে অদূরে দাঁড়িয়ে রইলো ভক্ত হনুমানের মতো। অভিমন্যু হাত নেড়ে জানালো কোন দরকার নেই। লোকটা সামনে থেকে কিছুদূরে স'রে দাঁড়ালো।

দূরের মাঠ থেকে সারাদিনের কাজ সেরে মেয়ে-পুরুষের দল ফিরছে। মেঠো ঘোড়ায় চ'ড়ে একটি গ্রামের ছেলে কোন্ পথ দিয়ে এসে যেন চ'লে গেল। সামনেই বড় বড় বাগান, নানাপ্রকার কেয়ারি করা ফুলের গাছ সারিবদ্ধ-ভাবে বসানো। এটা শুক্লপক্ষের প্রথম ভাগ,—একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে পশ্চিম আকাশে। এদিকে রেল-স্টেশন

নেই, ওদের গাড়ী চ'লে এসেছে রেলপথের ঠিক বিপরীত দিকে। সুতরাং অভিমন্যুকে ফিরতে হ'লে তপতীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তপতী নারীমহলের গৌরব, সন্দেহ কি! প্রথম অভিমন্যু তা'কে দেখেছিল তরুণী ছাত্রী—অনভিজ্ঞ কিন্তু উদ্দাম; বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, ছিল অক্লান্ত অধ্যবসায়। অভিমন্যু সেই কাঁচা লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে ইস্পাতে পরিণত করে, তারপর তাই থেকে বানিয়ে তোলে শানিত উজ্জ্বল ফলা। কালক্রমে তপতী হয়ে উঠলো তেজস্বতী,—তা'র মধ্যে এসে পৌঁছলো ধারালো প্রতিভা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব। নিজের শক্তিতে নিজেকে সে অতিক্রম করেছে, কিন্তু আপন প্রকৃতির চারিপাশে বাঁধন দিয়েছে অটুট। কারাবরণ করেছে সে ঝা'র তিনেক হাসিমুখে,—প্রথম, ব্যক্তিস্বাধীনতার বাধা সে বরদাস্ত করতে পারে না : দ্বিতীয়, কারাজীবনে সে এক প্রকার তপশ্চর্যার সুবিধা পেয়ে যেতো। কারাপ্রকোষ্ঠ ভ'রে যেতো রাশি রাশি বই আর কাগজে। ওই জ্ঞানচর্চার ভিতর থেকেই সে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু কারাগারের ভিতরে ব'সে যে এক-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা সযত্নে গ'ড়ে তোলা যায়, কারামুক্তির পর বাইরে এসে তা'র অনেকটাই ফিকে হয়ে আসে। তখন আসে নিরুপায় বেদনাবোধ আর নৈরাশ্য। সেই নৈরাশ্য মাঝে মাঝে তপতীকে চেপে ধরতো। কী যন্ত্রণা তার, অভিমন্যু লক্ষ্য

করেছে। কী মুক্তির পিপাসা,—সে পিপাসা চিত্তলোকের। অসীম অগাধ স্বাধীনতার ভিতরেও মানুষ তা'র বন্ধনজর্জর আত্মার একপ্রকার ব্যাকুলতা বোধ করে, তপতীর ছিল সেই আকুলি বিকুলি। তা'র কারাজীবন ভ'রে ছিল যেন অসংখ্য আশা আর আশ্বাসে, স্বপ্নে আর পরিকল্পনায়,—বাইরে এসে দেখতে পেতো অনন্ত বিষাদসিন্ধু, অপরিসীম শূন্যতা। মনে পড়ছে, এমনি এক সন্ধ্যায় ডায়মণ্ডহারবারের সেই উঁচু বাঁধানো চত্বরে তপতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে অভিমন্যুর দুই হাত জড়িয়ে ধরেছিল। সেই নিরুদ্দেশ বেদনার জর্জরতা,—অভিমন্যু দেখেছে। তা'র এলোমেলো মনের কথাটা ছিল এই, পথ কি? জীবন কি? কিসের জন্য এই মুক্তি সংগ্রাম? পিপাসার সান্ত্বনা কোথায়? কী চাই? কী পেলে আর কিছু পাবার বাসনা থাকবে না? কেন প্রশ্ন ওঠে বা'র বা'র? কেন খুঁজে পাইনে পথ অন্ধকারে?

সেই আর্তকণ্ঠ অভিমন্যুর আজও মনে পড়ে। অভিমন্যু তা'র হাতে গীতার ভাষ্য তুলে দিয়েছিল। কিন্তু কী চেয়েছিল তপতী সেদিন? পুরুষের প্রেমের স্পর্শ?—আজকের দিনের এই চাকরি? না, কোনোটাই না। সে চেয়েছিল নির্ভুল নির্বাধ আত্মপ্রকাশ! নিজেকে সে টুকরো-টুকরো খণ্ড-বিখণ্ড করেছে, করেছে চূর্ণ-বিচূর্ণ পরবর্তী কালে! বনহংসীর ডানা-ঝটাপটি ছিল তা'র চিত্তের পিঞ্জরে, সেই হংসী পরিপূর্ণ পাখা মেলে অনন্ত গগনের

উদার মুক্তির মধ্যে ছুটতে চেয়েছিল। তপস্বিনী জানতে পেরেছিল দেশের মুক্তি আসন্ন,—কিন্তু তা'র অনেক আগে নিজে সে মুক্তিলাভ করেছিল। সে কোথায় যেন কেমন ক'রে পেয়েছিল দৈবের আশ্বাস, অমৃতের আস্বাদ। সেই দিন থেকে ঘুচেছে তা'র চিত্তগ্লানি, খুঁজে পেয়েছে নির্ভুল পথের নিশানা, দেখে নিয়েছে কাজের চেহারা। বিদায় নেবার আগে সে অভিমন্যুকে ব'লে এসেছিল, ঘর ভেঙ্গে দিলুম,—কেননা এঘর সুখের, আনন্দের নয়। এবার আমি সোজা চ'লে যাবো, কোথাও পথ হারাবো না। পা টলবে না, ভয় পাবো না, বাধা মানবো না—তুমি দেখে নিয়ো। আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে বিশাল ভারত, —প্রাচীন তপস্বী ভারত, মুনিঋষিময় তপোবনময় ভারত। আমার পথের চারিপাশে রয়েছে কত যুগযুগান্তের, কত কাল-কালান্তের মহাপুরুষ, কত মহারমণী! আমার পিছনে রয়েছে কত বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, শাস্ত্র, দর্শন, কত তপস্বীর কত উদার মন্ত্র, কত সামগান, কত বেদ-মন্ত্রগাথা। আমার পথের ভুল হবে না—তাঁদের রয়েছে আশীর্বাদ, রয়েছে তাঁদের আনন্দময় উৎসাহদান। আমি এগিয়ে যাবো, তুমি দেখে নিয়ো, কোনো বাধা স্বীকার করবো না, —গঙ্গার গৈরিক ধারার মতো প্রবাহিত হয়ে যাবো। দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শত্রুর চক্রান্তে, অন্যায়ের আক্রমণে আমি ভয় পাবো না—আমি এগিয়ে যাবো শান্তির প্রদীপ

হাতে নিয়ে। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে আমি তপস্যা ক'রে এসেছি পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হবার,—এবার আমার চলবার সাধনা হবে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হবার। তুমিও ভয় পেয়ো না অভিমন্যু, বিশ্বমানবতার অন্তরে যে-গ্লানি আবার দেখা দিয়েছে, সভ্যতাকে বিনাশ করার জন্য মানুষের অবচেতনার নিম্নতম স্তরে যে-পশু আবার জেগে উঠতে চাইছে, তাকে সংহার করো—নৈলে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার আর কোনো উপায় থাকবে না; যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য দুষ্টশক্তি এগিয়ে এসেছে, তাকে বাধা দাও,—নৈলে মানুষের মুক্তির আর কোনো পথই খোলা থাকবে না। আজ যে সংগ্রামের করাল ভয়াল ছায়া পৃথিবীর আকাশ আচ্ছন্ন করতে চাইছে, সে-সংগ্রাম সভ্যতাকে রক্ষ্য করার জন্য নয়, সে হোলো কোটি কোটি মানুষের অন্তর্নিহিত কোটি কোটি দেবতাকে সগৌরবে তুলে ধরার জন্য। মনুষ্যত্বের অসীম পিপাসা দেবত্বলাভের পথে।

অভিমন্যু তপতীকে সেদিন বাধা দেয়নি, তপতী নিজের পথ বেছে নিয়ে চ'লে এসেছে কাজের মধ্যে। ভালোবাসা যে একটি স্নেহ-বন্ধনকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার ক'রে নেয়, তপতী একথা মানে না? সে খুঁজে পায় ভালোবাসার মধ্যে বন্ধনহীন মুক্তি, পায় সে স্বচ্ছন্দ গতি,—নিভৃত বিরামের কোটর তা'র জন্য নয়।

পিছনে পায়ের শব্দে অভিমন্যু সচকিত হয়ে ফিরে

তাকালো। যে-লোকটি কতক্ষণ আগে অতিথির তদারকে ছিল, সে এবার একটি রূপার ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তা'তে ছিল কলা, পেয়ারা, কিছু মিষ্টান্ন ও মালাই। টিপাইয়ের উপর সেগুলি রেখে লোকটি প্রশ্ন করলো, হুজুর, চা পিনা?

অভিমন্যু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

লোকটি চ'লে যাবার পর অভিমন্যু ফিরে দেখলো, ঘরের ভিতরে আলো দেওয়া হয়েছে, ধূপধূনার মৃদু গন্ধ আসছে তা'র নাকে। দূরের মন্দিরে সন্ধ্যারতি কখন্ শেষ হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ একটু হেলে পড়েছে। কখন যে একটি মিষ্ট মধুর অবসাদে অভিমন্যুর মন ক্লান্তিতে ভ'রে এসেছিল, সে বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে-মোহ যেন কেটে গেল।

কিছু জলযোগের পর সে যখন সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছে, সেই সময় তপতী দ্রুতপদে এঁকে বেঁকে উঠে এলো বাংলার বারান্দায়। সে সরকারী লোক, সুতরাং এইটুকু পথের জন্য তা'র সঙ্গে জমিদারের দুজন পাইক এসেছিল। তপতী যদি আজ রাত্রে এখানে থাকে তবে তারা নহবৎখানার নীচে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত সশস্ত্র পাহারা দেবে। আপাতত তপতীকে পৌঁছে দিয়ে তা'রা চ'লে গেল। তপতীর জন্য মোটর মোতায়েন রইলো সর্বক্ষণ; মুহূর্তের নির্দেশেই তা'রা গাড়ী আনবে।

তপতী এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে একবারটি অভিমন্যুর

গলাটা জড়িয়ে ধরলো। বললে, অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রেখেছি, নয় ?

অভিমন্যু হাসিমুখে বললে, মেয়েদের তাঁবেদারি না করলে এ যুগে পুরুষের অন্ন নেই।

তপতী খিল খিল ক'রে হাসলো। হেসে বললে, সামান্য কিছু খেয়েছ, মনে হচ্ছে। আমি খাই এর থেকে।

পাত্র থেকে এক টুকরো মিষ্টান্ন তুলে তপতী মুখে পুরলো। অভিমন্যু বললে, ও কি ? তুমি খাওনি কিছু ?

খেয়েছি অনেক, কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ ত পাইনি !

লোকজনের উপস্থিতিতে তপতী মাথায় একটু ঘোমটা তুলে দেয়, এবার সে ঘোমটা নামিয়ে দিল। বললে, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে, এসো ঘরে যাই।

নিজেই সে ঘবে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু সামনে সুবিন্যস্ত বিছানা দেখেই সে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, এবং অভিমন্যু এসে পৌছবার আগেই পলকের মধ্যে সে পাশাপাশি বালিশের একটা তুলে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। সাধারণ লোক তাদের বুদ্ধি অনুসারে সাধাবণ বিছানাই সাজি'য় দিয়েছে, তাদের অপরাধ নেই।

অভিমন্যু ঘরে এসে ঢুকলো এই প্রথম। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বললে, ব্যবস্থাটা ভালোই, কিন্তু বড় অস্থায়ী।

তপতী বললে, দুঃখ হচ্ছে সেজন্যে ?

দুঃখ নয়, ভয় !

ভয় কিসের ?

অভিমন্যু বললে, বিশ্রামের লোভ পুরুষের সহজাত, জানো ত ?

তপতী বললে, আরামপ্রিয় মেয়েদের কাছে ওকথাটা নতুন নয়।

তুমি ত' আরাম চাওনি কোনোদিন ?

কে বললে ?—তপতী জবাব দিল, হতভাগি তা'র প্রাণের ঠাকুরকে কলকাতার পথে ভাসিয়ে দিয়ে সরকারি আরামের আশ্রয় বেছে নিয়েছে। কত ছোট হয়ে গেছি তোমার চোখে বলো ত ?

অভিমন্যু বললে, ছি, একথা বলতে নেই। কিন্তু এবার শুনি, এখানে তোমার কি কাজ ছিল ?

তপতী বললে, তোমার চোখ দুটো রাঙ্গা দেখাচ্ছে। একটু শুয়ে পড়ো এবার। শুয়ে শুয়ে শোনো।

অভিমন্যু প্রতিবাদ করলো না, বিছানায় উঠে অনেকটা যেন গা ভাসিয়ে দিল। তপতী তা'র দিকে একবার তাকিয়ে বাইরে গেল, সেই লোকটিকে ডেকে কি যেন বললে—একটু পরে আবার ভিতরে এলো। আলোটা ছিল উজ্জ্বল—সেটা একটু কমিয়ে সে অভিমন্যুর পাশে এসে বসলো। বললে, মানুষের লোভের আর সীমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,—বুঝলে, অভি ? এই রামজীবন কমপক্ষে নগদ কোটি টাকার মালিক। ছেলেপুলে নেই, খাবার লোক কম। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল, কিন্তু বাতব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু স্বামীর কদর্য রুচিবিকার সইতে না

পেরে নিজের পথ সে বেছে নিয়ে চ'লে গেছে। যাই হোক লোকটা বড় জমিদার। সম্প্রতি ওর একটা বড় তালুকে আবিষ্কার করা গেছে দামী কতকগুলো ধাতু, তা'র সঙ্গে কয়লা। পাঁচ হাজার একর জমির ইজারা বন্দোবস্ত দেবার জন্য লোকটা সেলামী চায় পাঁচ কোটি টাকা। এই নিয়ে দোকানদারি! আমি এসেছিলুম শেষবার ধমক দিতে। আইন জারি ক'রে ওর জমিদারি দখল করতে পারলেই ওর ঠিক শাস্তিটা হয়। আমি বললুম, গভর্ণমেণ্ট সেলামী দিতে অপারগ, শুধু ইজারা দেবার জন্য বছরে বছরে এক লক্ষ টাকা পেতে পারো! এ প্রস্তাবে রাজি অবশ্য ওকে হতেই হবে। কিন্তু লোকটা শেষকালে কি আবদার ধরেছে জানো? ওকে একটি মনের মতন বউ জুটিয়ে দিতে হবে! আমি বললুম, আপনার যোগ্য স্ত্রী কোথায় আর খুঁজে পাবো বলুন? তবে হ্যাঁ, থাকবার মধ্যে আমিই আছি! লোকটা ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কেঁপেই অস্থির। কী কদর্য ওর মুখের চেহারা দেখলুম! আসবার সময় পাষণ্ডকে ব'লে এলুম, আমার খুব আপত্তি নেই; তবে কিনা আমার স্বামীকে একবারটি জিজ্ঞেস করা দরকার। তিনি যা বলেন কিছুদিন পরে আপনাকে জানাবো!

তপতী মনের আনন্দে খুব হেসে উঠলো। কিন্তু অভিমন্যুর কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না দেখে সে হেঁট হয়ে লক্ষ্য করলো, অভিমন্যু কখন্ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাইরে থেকে সাড়া এলো, মাইজী ?

হাঁ—ব'লে তপতী উঠে এলো। চাকর এনেছে তিন চার খানা ভালো কম্বল,—তপতী সেগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে বললে, খাবার দিয়ো পরে, ব'লে পাঠাবো।

লোকটা কৃতার্থ হয়ে চ'লে গেল।—

আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে কাগজপত্র ও কলম নিয়ে তপতী কিছুক্ষণ টেবিলে বসলো। তা'র কাজের হিসেবটা লেখা দরকার। আজকের কাজটা তা'র সাফল্যলাভ করেছে, তা'র পদোন্নতি অনিবার্য। গভর্ণমেণ্ট তা'র সকল কাজেই তুষ্ট, দিল্লীর সরকারি মহল থেকে অনেকবার তা'র কানে এ সংবাদ এসেছে। কাল সকালে কমলের কাছে একটা টেলিগ্রাম যাবে, এ ব্যবস্থা সে করেছে। রামজীবনের খবরটাও কাল দুপুরে পৌছবে লক্ষ্ণৌর দপ্তরে,—পুলিশ সাহেবকে এ-নির্দেশ সে দিয়ে এসেছে। এদিকে কাজ সেরে তা'কে যেতে হবে কুমায়ুন জেলায়—সেখানে তা'র নানা ফরমাস। বেলাবনে ফিরে যেতে এখনো প্রায় একসপ্তাহ।

কিন্তু ফিরবে কি সে একা ? তপতীর ক্লান্ত তন্দ্রাতুর দুটো চোখ ফিরলো বিছানার দিকে। অভিমন্যুর নিদ্রা এবার ঘন হয়ে উঠেছে। কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে কলম বন্ধ ক'রে তপতী উঠে এলো। একখানা কম্বলের পাট খুলে সে ধীরে ধীরে অভিমন্যুর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল। তারপর পাশের জানলাটা বন্ধ ক'রে দেবার আগে সহসা

চোখ পড়লো তা'র বাইরের দিকে। বাইরে হিমাঙ্গ রাত, ওদিক থেকে আসছে শীতের ফুলের মৃদুস্নিগ্ধ গন্ধ। পশ্চিম আকাশে চন্দ্র যাচ্ছে নেমে,—কিন্তু আকাশের তারকাগুলি আজ যেন বড় উজ্জ্বল। পৃথিবীর উপরে ঘুম নামছে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে তপতী জানলাটা বন্ধ ক'রে দিল।

অভিমন্যুর নিদ্রার নিশ্বাসে রয়েছে একটি ছন্দ, যে-ছন্দটি মিলে যায় তপতীর বক্ষস্পন্দনে। তপতী তাকালো তা'র সর্বনাশার দিকে। সর্বনাশা নামটা সে দিয়েছিল একদিন রাগ ক'রে, কেননা অভিমন্যুর কাছে এসে দাঁড়ালে তা'র আত্মরোধের শক্তি আল্‌গা হয়ে আসতো। সে নিজে যেন ছিল কূলনাশিনী পদ্মা, আর অভিমন্যু ছিল যেন তরঙ্গ প্রবাহ। তটের গ্রন্থি বারম্বার শিথিল হয়ে যেতো সর্বনাশা তরঙ্গের অবিশ্রান্ত আকুলিতে। তপতী নতমুখে অপলক চক্ষে চেয়েছিল ঘুমন্ত অভিমন্যুর মুখের প্রতি। বড় কালো চোখের সে-চাহনি যেন লক্ষ লক্ষ যুগের,—কালো চোখের সেই কালো পাতায় রসের নিবিড় ছায়া যেন ঘুমে জড়িয়ে আসে। সে-চাহনিতে জীবন-মরণ একই দুর্লভ লগ্নে যেন থরথর ক'রে কাঁপে।

সহসা চকিত হয়ে ওঠে তপতী, এবং সেই মুহূর্তেই মুখ ফিরিয়ে সে স'রে আসে। অনুভব করে কপালে তা'র ঘামের বিন্দু জমেছে, ধমনীর রক্ত হয়ে উঠেছে উদ্দাম।

লজ্জায় ধিক্কার দিল সে নিজেকে, অনেকটা যেন অপমান বোধ করলো নিজের কাছে। তাড়াতাড়ি আলোটা একটু কমিয়ে বাইরে এসে সে বেতের চেয়ারখানায় গা এলিয়ে দিল।

পশ্চিম আকাশপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র মিলিয়ে গেল, শুধু রইলো তা'র বিষণ্ণ পাণ্ডুর আভা।

কিসের একটা আওয়াজে আচমকা অভিমন্যুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসলো। নহবৎখানার নীচে ঘণ্টা ঘড়িতে বাজলো রাত দশটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখলো তপতী ঘরে নেই। কি যেন একটা গল্প সে মাথার কাছে ব'সে আরম্ভ করেছিল শেষের দিকে, তারপর বাকিটা ঘুমের মধ্যে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। গায়ের উপব কম্বলটা চাপিয়ে দিয়ে গেছে তপতী, সন্দেহ নেই।

অভিমন্যু উঠে এসে আলোটা বাড়ালো। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে এবার তা'র শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে। দরজাটা খোলা ছিল, সে বাইরে এলো। লক্ষ্য করলো, এত ঠাণ্ডাতেও বেতের চেয়ারখানায় শুয়ে তপতী অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে! খোলা বারান্দায় হু হু ক'রে উত্তরের বাতাস বইছে। তপতীর কোনো কিছুতেই ভয়-ডর নেই।

অভিমন্যু কাছে এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভিতর থেকে ঈষৎ আলোর আভাস এসেছে বাইরের দিকে। তপতীর হুকুম ছিল, সে যদি বা ছোঁয় অভিমন্যুকে, অভিমন্যু নিজের

থেকে কখনও তপতীর একটি অঙ্গুলিও স্পর্শ করবে না। এই কৌতুকটা সে কায়েম ক'রে রেখে এসে" বরাবর। গলার সাড়া দিয়ে ডাকতে অভিমন্যু একটু আড়ষ্ট বোধ করলো,—কাছাকাছি কা'রো কৌতূহলী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'তে পারে। অবশেষে অভিমন্যু তা'র বলিষ্ঠ দুই হাতে বেতের চেয়ার সুদ্ধ তপতীকে তু'লে ধরলো। ঘুম ভেঙ্গে তপতী হাঁকপাঁক ক'রে উঠলো ভয়ে।

অভিমন্যু চুপি চুপি বললে, চুপ।—এই ব'লে সে চেয়ার নামালো।

তপতী উঠে এসে বললে, তিরিশ টাকায় পেট চলে না, কিন্তু দস্যির মতন হাতে জোর এল কোত্থেকে ?

অভিমন্যু বললে, শক্তিরূপিনীর স্পর্শে !

স্পর্শে ! হা পোড়াকপাল, জাত গেল কিন্তু পেট ভরলো না !—উঃ শীত ধরেছে এবার। দাঁড়াও, খাবার দিতে ব'লে দিই।—তপতী বেরিয়ে গিয়ে কা'কে যেন ডাকলো। কোন্ এক ব্যক্তি কোথায় অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে, সে ছুটে এসে ফরমাস নিয়ে গেল।

আহারাদির আয়োজনটা বিলাসপ্রিয় জমিদারের ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। তবে আনন্দের কথা এই, সবগুলোই নিরামিষ। আয়োজন যতটা বিপুল, ক্ষুধার পরিমাণ ততটাই কম। তবু ওদের আচরণে বোঝা গেল, এ অঞ্চলের জল হাওয়াটা ওদের ধাতে বসেছে। উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক কচুরী ও

হালুয়া এবং ক্ষীরজাত মিষ্টান্ন গ্রহণে ওদের বিশেষ কৃপণতা দেখা গেল না। কমলালেবুর পায়সটি অভিমন্যু তা'র দিকে সরিয়ে দিল দেখে তপতী বিশেষ দুঃখিত হোলো না। সরপুরিয়াগুলির স্বাদ ছিল অতি মধুর—সেগুলি আত্মবিস্মৃত অভিমন্যু একে একে গ্রাস করার পর হঠাৎ তা'র মনে প'ড়ে গেল, তপতীর জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়নি।

আহারাদির পর গরম্ জলে হাত মুখ ধুয়ে ওরা উঠে এলো ঘরে। তাম্বুলকরঙ্ক ছিল রৌপ্যপাত্রে, তা'র থেকে সামান্য মুখশুদ্ধি নিয়ে দুজনেই সেটা সরিয়ে রাখলো।

হাসিমুখে তপতী বললে, ভোজ্যগ্রহণের চতুর্বিধ পদ্ধতিই তুমি পালন করেছ, অভি—অর্থাৎ চিবিয়ে চুষে চেটে ও গিলে তুমি খেয়েছ মন্দ নয়। তোমার সুনিদ্রা হলে সুখী হবো।

অভিমন্যু বললে, কিন্তু আমি মনে মনে বিচার করছিলুম, যে, মেয়েরা সর্বনাশিনী, না সর্বগ্রাসিনী !

তপতী হেসে উঠে বললে, দুইই !

অভিমন্যু বিছানার একপাশে ঢাকা দিয়ে বসলো। তারপর বললে, তুমি যে মনের আনন্দে আছ একথা কাকীমা আমার মুখে শুনে খুশিই হবেন।

তুমি কি কালকেই যাচ্ছ সত্যি ?

হ্যাঁ, কালকেই যাচ্ছি।

তপতী বললে, কাকীমাকে ওই সঙ্গে একথা জানিয়ো যে,

অভিমন্যু রায় সম্বন্ধে তপতী আজও তা'র অভিমত বদলায়নি! তবে কিনা তপতী অপেক্ষা করবে চিরদিনই অভিমন্যুর জন্যে।

হাসিমুখে অভিমন্যু বললে, এসব কথা শুনলে কাকীমা সিদ্ধান্ত করবেন, এটা প্রেমের কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

তপতী বললে, কাকীমাও মেয়ে ছেলে। তিনি বুঝবেন যে, প্রেম মিথ্যে হয়ে গেল আর একটা বড় জিনিষের অভাবে।

সেটা কি?

সাধুভাষায় তা'র নাম লোককল্যাণের আদর্শ!

অভিমন্যু বললে, সে-আদর্শটা তোমার একার নয়, বেদেনী। তুমিও চাও বহুর কল্যাণ, বহু জীবনের সার্থকতা —আমিও চাই তাই। তফাৎ হচ্ছে প্রয়োগ নিয়ে। তুমি ওপর থেকে ঢেলে দিতে চাও প্রাণশক্তি,—আমি চাই প্রাণ সৃষ্টি হোক অনেক নীচের থেকে। তুমি চাও সংস্কার, আমি চাই সংহার।

তপতী ডাকলো, অভিমন্যু?

অভিমন্যু মুখ তুললো।

তপতী বললে, এ দুয়ের মাঝখানে কি কিছু নেই? সত্যি বলতে কি, অন্যায়ের বিনাশ আমিও চাই। কিন্তু বিদ্বেষ আর হিংসা ছাড়া তোমার সংহারের আর কি কোনো পথ নেই?

অভিমন্যু বললে, আঘাত মানেই ত' হিংসা!

তপতী বললে, কিন্তু দেবতার বজ্রদণ্ড, সেও কি হিংসা? কোথাও কি তা'র মধ্যে আশীর্বাদ খুঁজে পাও না, অভি?

দেবতার কথা জানিনে, জানি মানুষের। ইতিহাসে কোথায় দেখেছ, প্রেমের দ্বারা ঘট্ছে যুদ্ধ আর রক্তপাত ?

কোথাকার ইতিহাসের কথা বলছ ?

বলছি, সারা পৃথিবীর ইতিহাস !

তপতী স্মিতমুখে বললে, পৃথিবীর বাইরে রয়েছে একটি দেবভূমি—সে হোলো এই ভারত। এদেশের চিরকালীন সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়, দেবতা ও অসুরে। যুগে যুগে এই হোলো এদেশের জয় পরাজয়ের ইতিহাস। অসুর নিপাত হয়েছে দেবতার অশ্রুর ভিতর দিয়ে ! সব দেশে যুদ্ধ ঘটেছে রাজ্যরক্ষার জন্য, রাজ্যলাভের জন্য। এ দেশে তা'র বিপরীত। এদেশে বলা হয়েছে, যুদ্ধ করো অসুর বিনাশের জন্য,—ফলাফলের ভার তুলে দাও দেবতার হাতে। অন্যায়ের ধ্বংসের জন্য মৃত্যুকে ভয় করো না, কেননা তোমার পথ হোলো অমৃতলোকে। তুমি যন্ত্র, যন্ত্রী নও। তুমি কর্ম, কর্তৃত্ব নও। জীবন মানেই জীবন সংগ্রাম। যারা নরপশু তা'রা কেবল আত্মরক্ষার জন্যই লড়াই করে, যারা দেবশিশু তা'রা প্রতিনিয়ত দুষ্কৃত বিনাশের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে। শোনো অভিমন্যু, পথ আছে, আছে পথের নিশানা। যারা নিরুপায় নৈরাশ্যে শুধু ভাবে দেশব্যাপী বিপ্লব ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ খোলা নেই, তা'রা সাধনা করে শুধু মৃত্যুর। ধ্বংস মানেই জীবনের অস্বীকৃতি, বিপ্লব মানে বীর্যের অপচয়।

অভিমন্যু চেঁচিয়ে বললে, এ ভুল কেন করছ, বেদেনী ?

তপতী বললে, না, ভুল নয়। প্রবেশ করো নিজের অন্তর মন্দিরে। চেয়ে দেখো দেবতা জাগ্রত।

দেবতা যে উৎপীড়িত ?

না, ওটা ভুল। তিনি নিরাশক্ত। তিনি বিচার করছেন নিক্তির ওজনে। সেই বিপ্লব আনো যেখানে একবিন্দু পুণ্যেরও ক্ষয় হয় না। আনো সেই বিপ্লব, যে-বিপ্লব রূপান্তর আনবে মানুষের, যেটা দৈবাগত, যেটার দীপ্তিতে দেখে নেবো দেবত্বের প্রসন্ন আভা, সুন্দরের আনন্দময় শোভা। সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে নষ্ট করার জন্য সে-বিপ্লব এনো না, আনো জীর্ণতার ধ্বংসের জন্য। আমিও সংহার চাই অভিমন্যু,—কিন্তু হিংসা আর বিদ্বেষের পথে নয়! উঠে দাঁড়াও মথিত বিক্ষুব্ধ অশান্তির সিন্ধু তরঙ্গের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াও শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ ক'রে, বরাভয় ঘোষণা করো বিশ্বজীবনের দিকে চেয়ে। বলো দেহের শক্তি নয়, শক্তি হোলো আত্মার। তারপর এ দেশের অচল জড়ত্বের ওপর শানিত কুঠার হানো, হানো কুঠার আলস্যে, কুসংস্কারে, অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, হানো অলজ্জ মিথ্যা আর কুটিলের কাপুরুষতার উপরে। মিথ্যা, দুর্নীতি, আত্মঅবমাননা আর জীবনের সর্ববিধ অপচয়-বুদ্ধিকে মার্জনা করো না! ক্ষমা করো না তাদের, যারা এই বিশাল নবভারতের অভিনব যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে দানবীয় বুদ্ধির দ্বারা পণ্ড করতে চায়। যারা প্রেমে আনে বিচ্ছেদ, প্রেরণায় আনে

নিরুৎসাহ, জীবনে আনে নৈরাশ্য, কর্মে আনে জড়তা, বুদ্ধিতে আনে ভীরুতা—তাদের পরে আঘাত হানো। সেই তোমার মনুষ্যত্বের একমাত্র পথ,—সেই মনুষ্যত্বের বেদীর উপরে দাঁড়াবে দেবত্ব। সেই তোমার মুক্তি, অভি।

তপতী শান্ত হোলো! ঘড়ির ঘণ্টায় বাজলো রাত বারোটা।

অভিমন্যু চুপ ক'রে ছিল। এবার মৃদুকণ্ঠে বললে, কাল চ'লে যাবো, আবার হয়তো অনেক দিন দেখা হবে না। কিন্তু এই কথাটা আমার ব'লে যাবো বেদেনী, তোমার এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের কথা শুনলে আমি ভয় পাই।

কেন ?—বেদেনী প্রশ্ন ক'রে বসলো।

ওটাকে মোহ ব'লে মনে করি, কেননা ওটা মাদকের তুল্য। ওটা মানুষকে ঘুম পাড়ায়, জাগায় না। এই মাদক সেবন ক'রে মরেছে চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, বর্মা এবং তোমার এই দেবভূমি ভারত। দৈববিশ্বাস মূঢ় ক'রে তুলেছে, এনেছে নিষ্ক্রিয় জড়তা, এনেছে অন্ধতা। আজ চেয়ে দেখো প্রাচ্যের দিকে। বড় হয়ে উঠেছে নিরীশ্বরবাদ। কেন জানো ? এ যুগে ঈশ্বরের চেয়ে বড় হোলো ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়ে বড় হয়েছে পেটের ক্ষুধার তৃপ্তি, মোক্ষ লাভের লোভ অপেক্ষা বড় হয়েছে দুখানা ঘর ভাড়া পাবার চেষ্টা। মানুষের হাতে মানুষ মার খাচ্ছে, পশু আক্রমণ করছে মানুষকে, বঞ্চিত ক্ষুধিত মানবাত্মা কেবলই কায়েমী স্বার্থের

চাকার তলায় দলিত হচ্ছে,—এখন ঠিক প্রেম বিতরণের সময় নয়, বেদেনী !

তপতী বললে, কি করতে চাও ?

অভিমন্যু পাল্টা প্রশ্ন করলো, কাপুরুষের প্রেম, সত্য আর অহিংসাকে তুমি শ্রদ্ধা করো ?

একেবারেই না।

যদি কেউ তরোয়াল নিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে, কী জবাব দেবে তা'র ?

কে সে ?

অভিমন্যু বললে, তোমার শত্রু !

তপতী বললে, যদি আমার শত্রু সে না হয় !

অভিমন্যু চুপ ক'রে রইলো। তপতী বললে, আমিও যদি তা'র শত্রু না হই ? আসল কথা শোনো, সেই হোলো শত্রু, কল্যাণকে যে আঘাত করে, প্রেমকে যে অপমানিত করে। সেই সর্বমানবের শত্রুকে খুঁজে বা'র করো, তাকে দণ্ড দাও—কেননা সেই হোলো তোমার সকলের বড় বাধা। এমন কি সেখানে ক্ষমা করবে না পিতামাতাকে, ভাইবোনকে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে। যদি বিশ্বাস করো তা'রা অসুর, তা'রা তমসাচ্ছন্ন জীব—উচ্ছেদ করো তাদের। তা'রা তোমার পথে কণ্টক। তোমার পথ হোলো দেবতার পথ। দেবতাকে জাগিয়ে তোলো প্রত্যেক মানুষের অন্তরে, প্রত্যেক জীবনের মন্দিরে।

অভিমন্যু বললে, তোমার আশ্বাসে প্রগতিবাদী মানুষের দল সান্ত্বনা মানবে না, বেদেনী।

তপতী বললে, নিরীশ্বরবাদটা প্রগতিবাদ নয়, অভি। চেয়ে দেখো সৃষ্টির আশ্চর্য নিয়ম। এক এক যুগে আসে এক এক উপলক্ষ্য, এক এক ধুয়ো। নিরীশ্বরবাদ হোলো এ যুগের ধুয়ো, যাকে বলে ফ্যাশন্। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি নিজের মনে। বাইরে দেখি তাঁ'র আনন্দময় প্রকাশ, ভিতরে দেখি তাঁর সৌন্দর্যময় স্বরূপ। আমি তাঁর লীলাক্ষেত্র, আমি তাঁর বীণাযন্ত্র,—তিনি বাজালেই আমি বেজে উঠি, তাঁর নাচনের ছন্দে আমি স্পন্দিত হই। বিশ্বাস করো, অভিমন্যু—তোমার চারিদিকে সাংঘাতিক আসুরিক চক্রান্ত, পাপ অন্যায়ের বীভৎস ষড়যন্ত্র—মাঝখানে তুমি হ'লে এক বিন্দু পুণ্য। কিন্তু সেই অনেক। পুণ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল পাপকে পবিত্র ক'রে তুলবেই, তমসাচ্ছন্ন জীবনকে আলোকিত করবেই। তাকে বলবো সংস্কৃতি,—বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে যে কিছুতেই স্বীকার করে না, অসুরের অপমানে যার গ্লানি নেই, হৃদয়ে যার শত্রুতাবোধ স্থান পায় না।

অভিমন্যু স্তব্ধ হয়ে তপতীর দিকে তাকিয়ে ছিল। বেদেনীর দুটো চোখ যেন দপদপ ক'রে জ্বলছে।

তপতী পুনরায় বললে, চোখ বুজে দর্শন করো তোমার অন্তরের নারায়ণকে। ভয়ানক পরীক্ষা আজ তোমার সামনে। বিরোধ-শক্তি তোমার চারিদিকে,—ধ্বংসাত্মিক

শক্তি। শয়তানের কুচক্র পাশব ষড়যন্ত্রে মাথা তুলেছে, অজ্ঞানের ভয়াবহ কোলাহল, দুষ্টবুদ্ধির ছেলেখেলা, ভয়ভীরুর আস্ফালন, কুটিল পাণ্ডিত্যের মিথ্যা তর্কজাল, মূঢ় আলস্যের জড়তা, আত্মঘাতী যৌবনশক্তির বীভৎস অন্তর্দ্বন্দ্ব—এর মাঝখানে একা তুমি। এই তোমার অগ্নিপরীক্ষার দুর্লভ লগ্ন। মোহগ্রস্ত হয়ো না, অস্ত্রত্যাগ করো না, দয়া কৃপা ক্ষমার প্রশ্রয় দিয়ো না, স্বজনবিরোধের ভয় পেয়ো না, —তুমিও উঠে দাঁড়াও মাথা তুলে, চলো প্রগতির পথে। তোমার জীবনরথের সারথি হলেন তোমার অন্তর্যামী। আজ দয়াহীন প্রেমের দ্বারা আঘাত করো দুষ্টশক্তিকে। আজ তোমার মনুষ্যত্ব ও গৌরবের পরীক্ষা, ত্যাগ ও বীর্যের পরীক্ষা, আজ পরীক্ষা তোমার মহৎ ধর্মচেতনার। তোমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

তপতীর দীপ্ত কণ্ঠ শেষের দিকে যেন অনেকটা বুজে এলো। ভিতরে যেন তা'র তরঙ্গদলের আছাড়ি-পাছাড়ি বিক্ষোভ, তা'রই উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলো তা'র দুই চোখে। তাড়াতাড়ি উঠে সে বাইরে এলো। নীচে পৃথিবীর নিঃঝুম অন্ধকার, উপরে গগনে বিরাজ করছিল মহাশান্তি। নিজের মাথাটা দুই হাতে ধ'রে সে যেন আর কান্না সামলাতে পারলো না, ঝরঝরিয়ে নেমে এলো তা'র দুই চোখ বেয়ে। কিন্তু তবুও সে স্থির হয়ে নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে কান্না শেষ করতে পারলো না, ছুটে আবার এলো সে

ঘরের মধ্যে,—এবং একটি পলক মাত্র, তারপরেই সে উপুড় হয়ে পড়লো অভিমন্যুর পায়ের কাছে ।

অভিমন্যু সহসা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। তপতীর হাত ছুখানা ধ'রে সে ব্যস্তভাবে বললে, একি করছ তুমি ? ছি, ওঠো—

বলো, বলো তোমাকে কবে ফিরিয়ে আনতে পারবো ?

কোথায় ?

তপতী আতুর কণ্ঠে বললে, আমার জীবনে, আমার প্রাণে…আমার চেতনায়…

অভিমন্যু বললে, ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করো না, বেদেনী। আমি হয়ত নিজেই একদিন মাঝপথে এসে দাঁড়াবো,—তোমার হাত ধ'রে নেবো।

কান্নাটা আকস্মিক, কিন্তু কান্নাটা আন্তরিক। পনেরো বছর আগে পথের ধারে দাঁড়িয়ে যে-অভিমন্যুকে তপতী প্রথম আবিষ্কার করে, সে-অভিমন্যু ছিল শান্ত কিন্তু দৃপ্ত ; হৃদয় ছিল তা'র বড়, কিন্তু তা'র চেয়েও বড় ছিল তার আবেগ বিহ্বলতা। চুম্বকের মতো তা'র সেই সহজাত আকর্ষণ শক্তি টেনে আনতো সেদিনের কত তরুণ তরুণীকে। প্রখর ছিল তা'র পরিহাসবুদ্ধি, প্রখরতর ছিল তা'র ইংরাজ বিদ্বেষ। তা'র কর্মশক্তি ছিল প্রবল, উদ্যম ছিল অক্লান্ত। নব নব কাজের পরিকল্পনায় অভিমন্যু ছিল অদ্বিতীয়। মনে হোতো সে যেন বিদ্যুৎশক্তির মস্ত একটা

আধার,—সবাইকে সে সক্রিয়, গতিশীল এবং আবেগপ্রবণ ক'রে তুলতে পারতো।

এ অভিমন্যু সে নয়, তপতীর বেদনাবোধ সেই কারণে। আজকের অভিমন্যুর হৃদয় যেন শুকিয়ে গেছে, অপমৃত্যু ঘটেছে তা'র সেই পরিহাসবুদ্ধির। দৃষ্টি হয়েছে তা'র ভীষণ, চিন্তার ধারা হয়েছে কঠোর। পাণ্ডিত্যে তা'র খ্যাতি, কূটনীতির জন্য সে কুখ্যাত,—রাজনীতিক সংস্থার বিশ্লেষণ শক্তির জন্য বিপক্ষ দলেও তা'র প্রতিপত্তি কম নয়। সেদিনকার সেই অভিমন্যু আজ স্তব্ধ। সেদিন সে আলো দিয়ে এসেছে সকলকে, আজ অগ্নির আভা বিস্তার করেছে সকল দিকে,—আসছে তা'র দিকে পতঙ্গের দল।

সেদিন অভিমন্যু ছিল নিমীলিতনেত্র শিব, আজ কালকটাক্ষ রুদ্র। এদিনের অভিমন্যুকে ধ'রে সেদিনের অভিমন্যুর জন্য তপতী কাঁদলো।

*

* *

গাড়োয়াল জেলার পাশেই কুমায়ুন,—এরই কোনো একটি পার্বত্য অঞ্চলে তপতী এসে পৌঁছেছে। সামনেই রামগঙ্গা নদী, তারই তীরভূমির একস্থলে সরকারি তাঁবু পড়েছে। এদিকের অনেকটা জায়গা জুড়ে সমতল ক্ষেত্র। স্থানীয় এক ভূঁইয়া জমিদারের সঙ্গে টিহিরীর কিছু বিরোধ আছে,—সে-বিরোধ জমি ও খাজনা আদায়ের ব্যাপারে।

এটার একটা আপোষ মীমাংসা ক'রে তপতীকে শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ ফিরতে হবে। তা'র তাড়া ছিল।

আশপাশের তাঁবুগুলিতে জনকয়েক সরকারি কর্মচারী এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে—তাঁদের সঙ্গে আছে ফাইল্ দপ্তর। সেগুলি তপতীর প্রয়োজনে লাগতে পারে। সমস্ত তাঁবু-গুলিকে পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সশস্ত্র গাড়োয়ালী পুলিশ। আজ সারাদিন ধ'রে আনাগোনার আর দেখাশুনার পালা শেষ ক'রে তপতীর ক্লান্তি এসেছিল।

বাইরে থেকে তাঁবুর ভিতরটা দেখা যায় না, সামনেই সুদৃশ্য পর্দা ফেলা। ভিতরে একপাশে নেয়ারের খাটিয়ায় নরম কম্বলের রাশির মধ্যে তপতী ডুবে রয়েছে, তা'র গায়ে কাশ্মীরি একখানা শাল জড়ানো। হাতের কাছে কিছু বই আর কাগজপত্র, তারই পাশে খোলা একটি ফাউণ্টেন্-পেন্। এক সময় অধীর ঔৎসুক্যে তপতী মুখ তুলে তাকালো।

শোনো অভিমন্যু,—যে-আচ্ছন্নতা তোমার চিত্তবৃত্তিকে কিছুকালের জন্য আবিল ক'রে রেখেছে, তা'র থেকে আগে নিজেকে মুক্ত করো। বিচারশক্তি তখনই নির্ভুল হয়, চোখ দুটো যখন খোলা থাকে। আগে তুমি চোখ খোলো। ইতিহাসের সত্য মূল্য তখনই বুঝতে পারি, যখন ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করি। রাজনীতি তখনই বড় যখন সে দেশের জীবননীতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে। ভারত-

বর্ষের যেটা রাজনীতিক ঐতিহ্য, সেটা হোলো দার্শনিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা,—একদিন তুমিই বলেছিলে, সেই-টিই ভারতীয় সভ্যতা। সেটি মানুষকে পথ দেখিয়েছে, জ্ঞান যুগিয়েছে, চিত্তবৃত্তিকে উন্নত করেছে। সকল দেশের রাজনীতি হোলো আন্দোলনমূলক,—তারা বড় ক'রে তুলেছে —বুদ্ধিকে, দলের ক্ষমতাকে, দেহের শক্তিকে। কিন্তু ভারতের রাজনীতি বুদ্ধি অপেক্ষা জ্ঞান বিতরণের পথকে খুঁজেছে, ক্ষমতা অপেক্ষা আনন্দের, দেহের শক্তি অপেক্ষা আত্মিক শক্তির। ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে কখন্? সে যখন কল্যাণকে ভুলেছে, স্বভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, স্বধর্মকে আঘাত করতে চেয়েছে! তুমি সামনের দিকে এগিয়ে চলো নির্ভয়ে, অভিমন্যু—কেননা পিছন থেকে ইতিহাস তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সংশয় থেকে ভীরুতা, ভীরুতার থেকে অশ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধার থেকে ঘৃণা! তুমি যে আজ ঘৃণায় আকণ্ঠ—তা'র প্রথম কারণ হোলো তোমার মনের অস্বাভাবিক সংশয়। তুমি নিজের পরে বিশ্বাস হারিয়ে আজ ঘোষণা করতে বসেছ ঘৃণা! বিন্যাসের ক্ষমতা নেই তাই প্রচার করতে বসেছ বিদ্বেষ? বিরাট আহ্বান যখন তোমার দরজার কাছে এলো, তোমার সৃষ্টিভয়ভীরু প্রবৃত্তি তখন অশ্রদ্ধার আলোড়নে মত্ত হয়ে উঠেছে। অভিমন্যু, একবার তুমি ফিরে দাঁড়াও।

চেয়ে দেখো সাতশো বছরের পর তোমার পায়ের

শিকল এই প্রথম খুলেছে। পুরুষ-পরম্পরায় পরাধীনতার সংস্কার তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, বিদেশী জাতি ও বিদেশী রাজশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রে এসেছ তুমি যুগে যুগে,—মার খেয়েছ শতাব্দির পর শতাব্দি, অপমানিত হয়ে এসেছ বংশানুক্রমে। ফলে কি হয়েছে জানো? স্বাধীন ভারতের সত্যকার রোমাঞ্চকর অর্থ তোমার মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। বনের পশু যখন পোষ মানে, তখন তাকে বনে নিয়ে গিয়ে শৃঙ্খল খুলে দিলেও সে প্রভুর কাছে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে আসে—অরণ্য-লোকের উদার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা, তা'র আর ভালো লাগে না। কেননা জীবযাত্রার ঋণ শোধ করে সে প্রভুর উচ্ছিষ্ট খেয়ে, প্রভুর শাসনে পায় স্নেহ, প্রভুর তিরস্কারে হয় সে কৃতার্থ। ভুলে যায় সে তার আনন্দময় স্বচ্ছন্দচারী আরণ্যক স্বাধীনতার জীবন। তুমিও নীতির থেকে ভ্রষ্ট, —সাতশো বছর ধ'রে হারানো মনুষ্যত্বের সন্ধান সহজে তুমিও পাও না। তুমিও জানো না কা'কে বলে অবারিত আশ্চর্য মুক্তি, কাকে বলে দেশের শৃঙ্খলহীন যৌবনের আনন্দময় পরিব্যাপ্তি। আজ যখন বহু শতাব্দির পর হঠাৎ প্রবল ও প্রচণ্ড মুক্তি তোমার চোখের সামনে জ্বলে উঠে দেশের আকাশকে প্রদীপ্ত ক'রে তুললো, তখন সেই আলোর ভাস্বরতা বরদাস্ত করতে না পেরে তুমি মূঢ়ের মতো দূরে পালাচ্ছ। পালাচ্ছ কোথায় জানো? অন্ধ

গুহার মধ্যে,—যেখানে আলো ঢোকে না; সুরঙ্গের মধ্যে —যেখানে কাপুরুষের আশ্রয়; অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে,—যেখানে সৃষ্টিশক্তির সর্বনাশা অপচয়; সাম্প্রদায়িক আত্মবিরোধের মধ্যে,—যেখানে বিকৃতবীর্য নরপশুর আনাগোনা; আত্মঘাতী দুষ্টশক্তির ধ্বংসাত্মক নোংরামির মধ্যে,—সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার যেটা শ্মশান-সমাধি। সেই অপমানের থেকে, সেই অধঃপতনের থেকে উঠে এসো, অভিমন্যু। উঠে এসে দাঁড়াও উদার মুক্তির নির্মল আকাশের নীচে। অগণ্য অধঃপতিত নরনারায়ণকে পঙ্কের থেকে তুলে ধরো, সমগ্র জগতের বক্র পরিহাস থেকে তাদের বাঁচাও, মূঢ় অজ্ঞানের অপমানবোধশক্তিহীন অলজ্জ কোলাহল থামাও,—তবেই তোমাকে বলবো প্রতিভা, বলবো বিপ্লবী, বলবো তুমি দেশকালজয়ী নেতা!

চেয়ে দেখো তোমার সমাজের দিকে। খুঁজে পাও কিছু? কোথা প্রেম, শান্তি, বন্ধুতা, সাধুতা, সততা,—কোথা গেল সেই পারিবারিক স্নেহ-মোহ-বন্ধন? কোথা আনন্দের সেই উজ্জ্বলতা? কোথা সেই বীর্য, বিশ্বাস, সম্প্রীতি, প্রাচুর্য, মাধুর্য? সমাজ জুড়ে কি থাকবে শুধু চৌর্যবৃত্তি আর অসাধুতা? থাকবে কি শুধু দুর্নীতি আর কালসর্প গূঢ়-ফণা? থাকবে কি শুধু ক্ষুধিতের বঞ্চিতের বিবস্ত্রের বিকৃত জীবনের আর্তরব? প্রতীচ্যের আকাশ সংশয়, ভয়, আর অবিশ্বাসে মসীকৃষ্ণ, প্রাচ্যের আকাশ হিংসায়, ঘৃণায়, আর

বিদ্বেষে আরক্তিম,—এই দুয়ের মাঝখানে তুমি কেন দোলায়-মান, অভিমন্যু? তুমি অমৃতের পুত্র, তোমার কণ্ঠে আছে অভয়মন্ত্র, তোমার হৃদয়ে আছে দৈববাণী, ধর্মাত্ম ভারতের অমিত তেজ তোমার প্রাণে, পরম সত্তার পরমাশ্চর্য দীপ্তি তোমার জীবনে,—পৃথিবীর জরা, ব্যাধি, রুগ্নতা, ভগ্নতা, নগ্নতা তুমি দূর করো তোমার মঙ্গলশঙ্খের ফুৎকারে, বিশ্বের মহা-জীবনের স্তরে স্তরে তোমার পুণ্যদীপ্তি প্রকাশ করো। বলো, ভয় নেই; বলো, ঘুচেছে বন্ধন, মিলেছে সন্ধান! বলো, শৃঙ্খলিত দেবতার মুক্তি ঘটেছে এবার, অন্ধকারের অসুরদলের দুর্ধর্ষ স্পর্ধার অবসান ঘটবে এবার,—আর্ত-ত্রাণের শুভলগ্ন সমাগত! অভিমন্যু, তুমি আশীর্বাদ গ্রহণ করো প্রাচীন ভারতের, দায়িত্বভার গ্রহণ করো নবভারতের।

অভিমন্যু, অভিমান রেখো না মনে। কাছের দৃষ্টি অনেক সময় বিভ্রান্ত করে, সমকালের অবস্থা অনেক সময় মানুষকে চঞ্চল ক'রে তোলে। দূর অতীতের দিকে তাকাও, দূরতর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখো। তুমি সামান্য, কিন্তু তোমাকে অসামান্য হয়ে উঠতে হবে। মনুষ্যত্বের দাবি হোলো এই। আজ যারা তোমাদের দেশে ক্ষমতার উচ্চ চূড়ায় সমাসীন—তারা হয়ত যশ আর প্রতিষ্ঠার অধিকারী, কিন্তু চিরায়ুর অধিকারী তা'রা নয়। তা'রা যৌবনান্ত, রণক্লান্ত, কর্মশ্রান্ত,—কিন্তু তুমি? তুমি নবযৌবনের প্রতীক, তুমি ক্ষয়হীন, ভয়হীন—তোমাকেই তুলে ধরতে হবে হাল, খুলে ধরতে হবে পাল—তোমাকেই

আগামীকালের নবভারতের সৃষ্টিচেতনাব গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। মনে রেখো, অভিমন্যু,—তোমার পরিচয় বিপ্লবে নয়, বিদ্রোহেও নয়। তোমার পরিচয় ধ্বংস ও ঈর্ষায়, আঘাতে আর সংঘাতে নয়,—তোমার পরিচয় প্রেমে ও কল্যাণে, তোমার পরিচয় সেবায় ও সান্ত্বনায়, সৃষ্টিতে ও সংস্কৃতিতে। ইতিমধ্যে দেখেছ তাতার-দস্যু চেঙ্গিস খাঁ বড় হয়নি, কিন্তু তাতারসন্তান কেমাল পাশা পূজ্য হয়েছেন। এদেশে ধর্মদ্রোহী কালাপাহাড়ের নাম কে না জানে, কিন্তু সম্রাট অশোক জগৎবরেণ্য! রাষ্ট্রদ্রোহীর রক্তচক্ষু দেখে ভারত অনেকবার ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভারতেব মহাজনগণের সহজাত সংস্কৃতির সিন্ধুতরঙ্গে কোথায় তা'রা তলিয়ে গেছে! লক্ষ্য করো সমসাময়িক ভারতের দিকে। দানবশক্তি এই বিরাট দেশের সংহতিকে সেদিন আর একবার নষ্ট করলো। একালের দুর্যোধন বহিঃশত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আনলো জাতিবিদ্বেষ, গৃহবিচ্ছেদ, ভাঙ্গলো ভারতকে! অপর দিকে দেখো, তপস্বী ভারতের সেই প্রাণপণ ঐক্য সাধনা,—সকল জাতি সকল সম্প্রদায় সকল ধর্মের মধ্যে সেই সংহতি স্থাপনের চেষ্টা। আগামীকালের ইতিহাস এই রাষ্ট্র-আলোড়নের ভিতরে কল্যাণেব চিহ্ন খুঁজে পাবে কি? খুঁজে পাবে কি এদিনের শরণার্থীদের দুঃখ-বেদনা-দুর্দশার নিহিতার্থ? দুর্ভাগ্যের নিরুপায় ক্রীড়নকের শোচনীয় দিনযাপনের গ্লানির কালো দাগ থাকবে কি মহাজনগণের স্মৃতির পটে? দানবের

কাহিনী ইতিহাসেও অমরত্ব লাভ করে! কেন জানো? উত্তরোত্তর কালের বংশপরম্পরা তাদেরকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে অভিসম্পাত বর্ষণ ক'রে যায়! সেই কারণে ভারতের পুরাণ আর ইতিহাস সংখ্যাতীত দানবের কাহিনীতে পরিপূর্ণ!

অভিমন্যু, বাঙালীর রক্তের মধ্যেও আছে চেঙ্গিস খাঁ আর কেমাল পাশার সংমিশ্রণ! সংহার আর সৃষ্টি, হিংসা আর প্রেম, বিপ্লব আর বিদ্যা, সম্ভোগ আর সন্ন্যাস, ভীরুতা আর ক্ষাত্রতেজ, সংশয় আর সাহস, অপৌরুষ আর বীর্যবত্তা,—বাঙালীর রক্তে পরস্পর বিরোধী গুণপণার আশ্চর্য সমাবেশ। গোরাপল্টনের গুলীচালনার সামনে দাঁড়িয়ে অটল নির্ভয়ে সে প্রাণ দেয়, কিন্তু সামান্য গুণ্ডার ছুরির ভয়ে পাড়া ছেড়ে সে পালায়! শক্তিমানের বিরুদ্ধে নির্ভীক বাঙালী সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু কাপুরুষের কাছে হার মেনে ভীত শিশুর মতো সে আঁচলের তলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়! বাঙালীর নেতৃত্ব যখন মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন সে গগনচুম্বী,—সমগ্র দেশের আকাশ সেই নেতৃত্বের আভায় ভাস্বর হয়ে ওঠে; কিন্তু এই বাঙালী নীচে যখন নামে তখন সর্বাঙ্গে কাদা মাখে, পাঁক ঘাঁটে, নোংরার মধ্যে ডুবে গিয়ে হানাহানি করে, ভাবের সমস্ত কদর্যতাকে ঘুলিয়ে তোলে, সমস্ত দেশে দুর্গন্ধ ছড়ায়, শ্মশান-শৃগালদলের কোলাহলে বিশাল ভারতের

কান বধির ক'রে তোলে। এককালে এই বাঙালী ইংরাজকে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল, এই কালে দেখেছ একটি-একটি ইংরাজকে হত্যা করেছে এই বাঙালী হিংসায় উন্মত্ত হয়ে। বাঙালীর প্রিয় হোলো বিপ্লব, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ওলটানো, তিলমাত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ানো, নিষেধের পাথরে মাথা ঠু'কে নিজের মাথার রক্তপাত করা—আবার এই বাঙালী বিদ্যায়, জ্ঞানে, দর্শনে বিজ্ঞানে, দেশপ্রেমে, আত্মোৎসর্গে, মহত্ত্বগৌরবে এই বিশাল ভারতে অদ্বিতীয়। আততায়ীকে বাঙালী যখন হত্যা করে, তখন বলে, বন্দে মাতরম্,—কালীঘাটে গিয়ে যখন পাঁঠা বলি দেয়, তখনও করালী ভয়ভীষণার দিকে চেয়ে সে বলে, রক্ত গ্রহণ করো, মা! তোমার কি মনে পড়ে এই বাঙালী মুক্তিসাধনার প্রথম মন্ত্র যুগিয়েছিল ভারতকে একশো পঁচিশ বছর আগে,—সেদিনের ভারত যখন অসাড় নিদ্রায় অচেতন? তোমার কি মনে পড়ে, বহুবিচ্ছিন্ন ভারতের সমন্বয় সাধনার জন্য এই বাঙালী একটি রাষ্ট্রসভা গ'ড়ে তোলে উনিশ শতকের শেষ দিকে—যার সাহায্যে আজ স্বাধীনতা লাভ করেছ? এই বাঙালীর দুর্ভিক্ষ পীড়িত মৃতদেহ এই সেদিন ইংরেজ আর আমেরিকান্ মিলিটারী লরীর নীচে কীটপতঙ্গের মতো দলিত হোলো, কিন্তু সেদিন লুট ক'রে খেয়ে বাঁচতে চাইলো না বাঙালী,—মনে হয়েছিল এই মূঢ় জাতির মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র অবশেষও

আর বাকি নেই! কিন্তু চেয়ে দেখো, এই বাঙালীর এক বিরাট পুরুষ আপন ক্ষাত্রবীর্যতেজে সমগ্র পূর্বপ্রাচ্যের অচেতন ধমনীর মধ্যে আনলো উত্তপ্ত রক্তের প্রবাহ, আজাদ হিন্দ আন্দোলনের তরঙ্গের আবেগে মুমূর্ষু বাঙালী নবচেতনায় উঠে দাঁড়ালো সাংঘাতিক মূর্তি নিয়ে, আনলো নৌ-বিদ্রোহ, আনলো আবার সিপাহী বিদ্রোহ! ফলে, ইংরেজ শাসনের হাল ভেঙ্গে গেল, পাল ছিঁড়ে গেল, নৌকা গেল ফুটো হয়ে! বাঙালী নিজের অপমৃত্যুকে ডেকে আনে, আবার জীর্ণতার বিরুদ্ধে খড়্গ তুলে দাঁড়ায়; একহাতে সংহার করে অন্য হাতে সৃষ্টির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। এক চোখে সে অগ্নিক্ষরণ করে ঘৃণায়, অন্য চোখে সে অশ্রুবর্ষণ করে প্রণয়ে। কস্তুরী মৃগের মতো সে ছুটে বেড়ায় বিশ্বভারতে, কিন্তু বোঝে না নিজ নাভির গন্ধে সে উন্মাদ।

অভিমন্যু, প্রদোষের ঘনঘটায় বাঙলার আকাশ আবার যখন আচ্ছন্ন, তুমি তখন তরবারির ফলকে শান দিতে বসেছ। ঝড় আসবে, কিন্তু তুমি কি শুকনো পাতার মতো উড়ে যেতে চাও? ভেসে যেতে চাও সমসাময়িক কালের প্রবাহে? স্বকীয় মন্ত্র কিছু কি নেই তোমার? বিদ্যা কি তোমার নিঃশেষ? যৌবন কি জরাব্যাধিগ্রস্ত? তবে কি এই কথাই বুঝবো যে, অসম্মানে, অধঃপতনে, অনাচারে, দুর্ভিক্ষে, দুর্দশায়, রাষ্ট্র-বিপ্লবে, বঙ্গবিচ্ছেদে—তুমি কোনো শিক্ষাই লাভ করোনি? কোনো মূল্যই দিতে শেখোনি? তবে কি বুঝবো তোমার

স্বভাবে শুধু অসুরের কোলাহল, তোমার জীবনসমুদ্র মন্থনে শুধু সর্বনাশা হলাহল ?

অভিমন্যু, তুমি যদি সত্যকার গরলাধার নীলকণ্ঠ হও, তবে এই তোমার অমৃতবর্ষণের কাল ! এই তোমার শেষ পরীক্ষা মনুষ্যত্বের, তোমার প্রথম পরীক্ষা দেবত্বের !

তাঁবুর বাইরে অন্ধকার রাত্রি ঘন গভীর হয়ে এসেছে। রামগঙ্গা নদীর দিক থেকে উত্তরের হাওয়া এসে তাঁবুর পর্দা নেড়ে চলেছে। বাইরে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী মাঝে মাঝে নিয়ম মতো হাঁক দিচ্ছে,—এদিকে রাত্রিকালে মধ্যে মাঝে নাকি জানোয়ার আসে।

নেয়ারের খাটিয়ায় ঘন উষ্ণ বিছানার মধ্যে ধীরে ধীরে তপতীর দুটি জাগরণক্লান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। সে যেন তা'র প্রাণের ভরা ঘট অভিমন্যুর পায়ের কাছে উজাড় ক'রে দিয়ে অপরিসীম পরিতৃপ্তিতে ঘুমের মধ্যে ডুব দিল।

যে-বিরোধ ঘটেছিল ভূঁইয়া জমিদার আর টিহিরির মধ্যে তা'র সম্পূর্ণ মীমাংসা করতে আরো দুদিন লাগলো। এর মধ্যে তপতীকে একটি কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করতে হোলো। নিকটে গ্রামে ছিল একটি সংস্কৃত বিদ্যামন্দির, সেখানকার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় তাকে সভানেত্রী পেয়ে বিদ্যার্থীগণের মধ্যে আনন্দ কলরব দেখা গেল। রাম-গঙ্গা নদীতে বর্ষায় বন্যা দেখা দেয়, তা'র জন্য কি প্রকার

বিভিন্ন মুখী খাল খনন করলে আশপাশের জেলায় ভালো চাষ হ'তে পারে, তা'র আলোচনার জন্য এলো পি-ডবলু-ডির কয়েকটি বিশেষজ্ঞ। এই সমস্ত কাজকর্ম সেরে সে যখন তৃতীয় দিনে লক্ষ্ণৌ যাত্রার জন্য মোটরে উঠলো, তখন বেলা প্রায় নয়টা।

তপতীর সঙ্গে দেহরক্ষী ছিল, গাড়ীখানাও সরকারী। গাড়ীর মধ্যে সে একা ছিল না, তা'র পাশেই কুণ্ঠিতভাবে ব'সে-ছিলেন রামপুরের একজন সরকারী কর্মচারী। সে ভদ্রলোক অতিশয় আড়ষ্ট ভাবে এক কোণে ব'সে বাইরের দিকে সেই যে মুখ ফিরিয়েছিলেন, এ পর্যন্ত এদিকে আর ফেরেননি। মাঝপথে কোথায় যেন তিনি নেমে যাবেন, এইরূপ কথা আছে।

তপতী প্রথম থেকেই অন্যমনস্ক ছিল। মোটরের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি যে তা'র সহযাত্রী রয়েছেন, একথা তা'র মনেই ছিল না। পাকা রাস্তা সোজা চ'লে গেছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে। পথের বাঁ দিকটা পাহাড়ী অঞ্চল, ডান দিকটা শস্যশ্যামল প্রান্তর। কোথাও কোথাও পথের তলা দিয়ে চ'লে গেছে দূরের ঝরণার ধারা নালী রচনা ক'রে প্রান্তরের দিকে—উপরের ছোট ছোট বাঁধানো সেতুর উপর দিয়ে মোটর হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। শীতের সুন্দর রৌদ্র ঝলমল করছে চারিদিকে। বাতাস মৃদু স্নিগ্ধ—প্রথম বসন্তের মতো।

বসন্ত! হঠাৎ চোখের সামনে আবার এসে দাঁড়ালো

অভিমন্যু! একবার তা'রা গিয়েছিল রাণাঘাটে—সেখানে তা'র এক সহপাঠিনী কম্‌রেডের বিবাহ ছিল। ফিরবার পথের সন্ধ্যার কথা মনে হচ্ছে। মায়ের ছেলেমানুষী জিদের জন্য তপতীকে লোভনীয় পরিচ্ছদ ও কিছু অলঙ্কার পরতে হয়েছিল,—সেদিনের তপতীর সেই সজ্জাটা অভিমন্যুর পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছিল। ওরা ভুলে গিয়েছিল খদ্দর ছাড়া আর কিছু আছে এ সংসারে। কিন্তু বিস্ময় ছিল তপতীর চোখে। মা দিয়েছিলেন অভিমন্যুকে উপহার—পীতরঙের এক উত্তরীয়। সেই বাসন্তীরঙের উত্তরীয়তে ছিল চূর্ণ অভ্রের চিক্কণ। অভিমন্যুর ললাটে ছিল শাদা চন্দনের দাগ,—কমরেড নন্দিনী সাদরে সেই চন্দন এঁকে দিয়েছিল। অভিমন্যুর পোষাক-বিলাস ছিল না কোনো কালে, কিন্তু তপতী তা'র জন্য কিনেছিল ধুতি আর রেশমী পাঞ্জাবী! ট্রেনের সেই কামরায় আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। ছিল তা'রা দুজন—সেই দুজন, যারা চিরকালের যৌবনের প্রবাহে ভেসে এসেছে যুগ-পরম্পরায়। হঠাৎ তপতী যেন মনের মধ্যে খবর পেলো, তা'র যৌবনে বসন্ত সমাগম হয়েছে! অভিমন্যুকে এই চোখে কোনোদিন সে দেখেনি! এ সেই যেমন-তেমন মোটা খদ্দর পরা এলোমেলো অগোছালো আত্মবিস্মৃত অভিমন্যু নয়—এ আর একজন। এর রূপের সৌন্দর্যের যৌবনের কৌমার্যের তুলনা যেন ত্রি-ভুবনেও নেই! কী আশ্চর্য স্বাস্থ্য অভিমন্যুর, পাৎলা পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে কী সোনার বর্ণ বিচ্ছুরিত! এ

অভিমন্যু তা'র চোখে নূতন আবিষ্কৃত। এমন ক'রে অভিমন্যু আর কোনোদিন তা'র চোখে পড়েনি। নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি ক'রে তপতী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এ কামরায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে যেন স্বস্তি বোধ করতে পারতো।

সারাদিনের বিবাহের গোলমালে অভিমন্যু সংবাদপত্র ওল্‌টাবার সময় পায়নি—এ বেলায় গাড়ীর মধ্যে অবসর পেয়ে কাগজখানা সে মুখের সামনে ধ'রে বসেছিল। হাতে যখন শকুন্তলার কাব্য মানায়, তখন সেই হাতে রাজনীতির অশ্রাব্য সংবাদ! সেটাও তপতীর পক্ষে অস্বস্তিকর। এক-সময় সে বললে, সকালের কাগজ বিকেলে বাসি হয়ে যায়, তা জানেন?

অভিমন্যু হাসিমুখে বললে, এ কাগজে তোমার একটা খবর আছে, দেখেছ? তুমি নাকি নারীসমাজের মুখপাত্রী!

তপতী বললে, চাঁদের আলোটা সূর্যের কাছে ধারকরা! মিথ্যা গৌরব আমার ওপর চাপাবেন না।

হঠাৎ অভিমন্যু বললে, একি, তুমি যে আজ হঠাৎ উর্বশী-মেনকা মার্কা শাড়ী পরেছ? এমন ঝলমলে চেহারায় শিয়ালদা স্টেশনে নামবে কেমন ক'রে?

তপতী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল। কিন্তু নির্বোধের মতো তা'র দিকে তাকিয়ে থেকে অভিমন্যু এক সময় পুনরায় বললে, মাঝে মাঝে তোমাকে মন্দ লাগে না, কেন বলো ত?

গাড়ী তখনও কাঁচড়াপাড়ায় এসে পৌঁছয়নি। তপতী বললে, আপনার ভালোমন্দ লাগায় আমার কি এসে যায়!

অভিমন্যু আবার কাগজের দিকে মুখ ফেরালো। তা'র মুখে হাসি মাখানো ছিল।

বসন্ত বাতাস হু হু ক'রে জানলায় ঢুকে তপতীর মাথার শুষ্ক সুগন্ধ চুলের রাশ উড়িয়ে দিচ্ছিল। তা'র নিজের দেহে ও মনে যে-প্রাচুর্য এসে পৌঁছেছে, এটাকে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে দেশের কাজে। ফুল ফুটে যদি একদিন ঝ'রেও যায় ক্ষতি নেই, দরকার হোলো ফলের। কোনো মনো-বিকলন, কোনো চিন্তাবৈলক্ষণ্য, কোনো চিত্তবিকার যৌবনের —কিছুই চলবে না তাদের জীবনে। তা'রা উৎসর্গীকৃত, নিজস্ব সত্তা তাদের কিছুমাত্র নেই।

তপতী চোখ বুজে গাড়ীর জানলায় হেলান দিয়ে আধা শোওয়ার মতো ক'রে বসে ছিল। পেরিয়ে গেছে অনেক পথ, গাড়ীর চাকা ঘর্ষণ ক'রে গেছে অনেক ইস্পাত, কাঁচড়া-পাড়া নৈহাটিও গেছে পেরিয়ে। গাড়ীর প্রখর উজ্জ্বল আলোটা সোজা পড়েছিল তপতীর পরিচ্ছন্ন মুখখানির উপর,—সূর্যের দীপ্তি যেমন পড়ে সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্মের ললাটে। চুলের রাশি বাতাসে ছড়িয়েছে তপতীর মুখের চারিপাশে, তার হুঁস নেই। তবে কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে? গাড়ীতে যদি এখনই কেউ ওঠে তবে তপতীর বিবশা তনুলতা অভিমন্যুর পক্ষে কিছু লজ্জার কারণ হতে পারে বৈ কি।

কিন্তু তপতীর বেশ মনে পড়ে, তা'র চোখে সেদিন এতটুকু ঘুম ছিল না। অভিমন্যুর দিকে চেয়ে থাকলে সেদিন হৃত-ভাগীর পক্ষে চোখ ফেরানো অসম্ভব হোতো, তাই ছিল সে চোখ বুজে,—নিজেকে গোপন করার সুবিধা!

কিন্তু অভিমন্যু? খবরের কাগজখানা সরিয়ে দিয়ে সে কি সেই বসন্তসন্ধ্যায় দোলায়মান ট্রেনের মধ্যে ব'সে তপতীর মুখের দিকে সর্বগ্রাসী দৃষ্টি নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল না? দেবতা জানেন, তা'র নিশ্বাসের স্পর্শ লেগেছিল তপতীর কপোলে! উষ্ণ অধীর বাসনার একটু নিশ্বাস! কিন্তু থাক্ সে-রহস্য তপতীর হৃদয়ের মণিকোঠায়। শিয়ালদা স্টেশনে গাড়ী এসে থামবার ঠিক আগে অভিমন্যু তপতীর কানে কানে বললে, এবার নামতে হবে তপতী, ওঠো!

কানে কানে! কেন কানের অত কাছে! কেন সে তার রূঢ় হাতের ধাক্কায় তপতীকে ডাকলো না সেদিন? প্রগলভতার আভাস ছিল নাকি অভিমন্যুর মৃদুস্বরে? সেকথা আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে!

হঠাৎ পথের এক বাঁকে মোটরখানা কেঁপে উঠতেই তপতী সজাগ হোলো। অনেক দূর তা'রা চ'লে এসেছে। পাশের ভদ্রলোকটি সেই একভাবে ব'সে রয়েছেন বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তপতী সহসা যেন একটু কৌতুক বোধ ক'রে তাঁকে ডাকলো, আপনার বুঝি এখনো দেরি আছে নামতে?

ভদ্রলোকটী আড়ষ্ট হয়ে ব'সে ছিলেন। ভয় ছিল পাছে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করতে হয়। মুখ ফেরাতে তাঁর সাহস হোলো না। ব্যস্তভাবে বললেন, এই—এই কাছেই নামবো···আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে···আমাকে ক্ষমা করুন।

তপতী প্রশ্ন করলো, আপনার এখনও ঘাড় ব্যথা হয়নি ?

আজ্ঞে না···তেমন কই···না, কিছু না ?

তপতীকে দুর্বুদ্ধি পেয়ে বসলো। বললে, আপনি বুঝি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন না ?

শীতের হাওয়াতেও ভদ্রলোকটি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমাদের সমাজে···মানে, আমাদের বাড়ীতে,—মানে—ঠিক মেলামেশাটা নেই কিনা !

তপতী বললে, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন ? আপনার অবশ্যই ছেলে মেয়ে নাৎনীরা আছেন ?

ভদ্রলোক বললেন, আমি অল্পদিনই বিবাহ করেছি !

অল্পদিন !—আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কত বড় ? বয়স কত ?

তা কম নয়, বছর পনেরো ষোল হবে !

অ্যাঁ ? মানে, এই প্রথম বিবাহ আপনার ?

এতগুলি কথার জবাব দিতে গিয়ে ভদ্রলোকের যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

গাড়ী এসে থামলো এক গ্রামের ধারে। কাছেই এক পেট্রল পাম্পের দোকান। গাড়ীতে তেল নিতে হবে।

ভদ্রলোক এবার তাঁর ছোট এটাচি কেসটি নিয়ে নামলেন। যাবার সময় নমস্কার বিনিময় ক'রে যেতে হয়, এ জ্ঞান হয়ত তাঁর ছিল,—কিন্তু ·মেয়েদেরকে নমস্কার জানিয়ে বোধহয় নিজের পৌরুষকে খাটো করতে তিনি চাইলেন না। তপতী যখন নমস্কার জানিয়ে বললে, আপনাকে মনে রাখবো।—ভদ্রলোক তখন একথায় দুর্নীতির আভাস পেয়ে মুখ ফিরিয়ে হন হন ক'রে চ'লে গেলেন। তাঁর মুখে ছিল বিরক্তি, আর ভ্রূকুঞ্চন।

দৃশ্যটা সত্যই উপভোগ্য। অভিমন্যু কাছে থাকলে তপতী এতক্ষণ হেসে লুটোপুটি খেতো।

পেট্রল নিয়ে মোটর আবার ছুটে চললো। এ ভালো, এ একটা দুর্বার বন্য জীবন। অবরোধ নেই কোনোদিকে, নিষেধ নেই কোথাও, পিছন দিকে চাওয়া নেই। আছে অভিমন্যু একা দাঁড়িয়ে তা'র সামনে। তপতী যেন তা'র প্রত্যহ-জীবনের সমস্ত কাজ তারই উদ্দেশে নিবেদন ক'রে স্বস্তি পায়। সমস্তটার মধ্যেই অভিমন্যুর প্রেরণা, অভিমন্যুর উদ্দীপনা। সে রইলো মুখ ফিরিয়ে, তপতীর কাঁধে চাপলো গুরুদায়িত্বের বোঝা। অভিমন্যুকে ক্রিয়াশীল ক'রে তুলতে পারলে তা'র অবসর মিলতো। সে ছুটি নিয়ে চ'লে যেতো কোথাও নিরিবিলি। কোনো পাহাড়-পর্বতের নির্জন অধিত্যকায়, কিম্বা অজানা কোনো নদীতীরে। অরণ্যবাসিনী হলেই বা ক্ষতি কি ছিল? কোনো কাঠুরিয়ার কুটীরে,—

অখ্যাত, অজ্ঞাত একটা অপরিচয়ের মধ্যে। সন্ধ্যায় প্রদীপ দিত অঙ্গনে, প্রভাতে ফুল তুলতো উপবনে, আরতির ঘণ্টায় মুখর হোতো মন্দির। বয়ে যেতো পাশ দিয়ে ছোট্ট নদীটি, বৃক্ষচ্ছায়ায় ব'সে কাঠুরিয়া বাজাতো রাখালিয়া বাঁশী, গোধূলির তারাটি থাকতো তার সঙ্গী, ফুলের গন্ধে ঘুম ভেঙ্গে যেতো তা'র তৃণশয্যায়—নিদ্রারসে ভরা দুটি চোখ তুলতো কাঠুরিয়ার প্রতি।—সে-কাঠুরিয়া যদি হোতো সত্যবান? না, সত্যবান নয়, সে অভিমন্যু! সত্যবান রূপবান ছিল, কিন্তু তেজোগর্ভ ছিল না। মৃত্যুকে অমৃতময় করেছিল সাবিত্রী আপন প্রেমে আর স্বভাবের মহিমায়, নারীর শক্তি অতিক্রম করেছিল মৃত্যুলোক, পেয়েছিল মৃতসঞ্জীবনী। কিন্তু অভিমন্যু যে মৃত্যুঞ্জয়ী! অভিমন্যু এযুগের ভারতের একটা অভিনব প্রকাশ! কতকাল ধ'রে সে চ'লে এসেছে রূপ থেকে রূপান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। কিন্তু তা'র মৃত্যু ঘটেনি। আজ সে সমস্যাচ্ছন্ন, দুষ্ট শক্তির দ্বারা প্রভাবিত, দুষ্প্রবৃত্তির দল ঘিরেছে তা'কে চারিদিক থেকে, নানাদ্বন্দ্বে সে দোলায়মান,—তবু মৃত্যু নেই তা'র। অভিমন্যু সব ছেড়ে মহৎ বিনষ্টির পথে চলেছে, আর তাকে ফেরানো যাবেনা,—এ হোলো পরাজয়ের কথা, নৈরাশ্যের ব্যথা। কিন্তু অভিমন্যু ফিরবে, বাঙলার যৌবনের প্রতীক মৃত্যুর থেকে ফিরবে দেবত্বের পথে,—এই হোলো সর্বোত্তম বাণী। এই হোলো মহোত্তম সাধনা তপতীর।

সত্যবান রূপবান ছিল, কিন্তু বিপ্লববাদী ছিল না। অগ্নি আর বিষবাষ্প ঘুলিয়ে ওঠেনি সত্যবানকে ঘিরে, মারী-মন্বন্তর-অরাজকতা চক্রান্ত করেনি তা'র জীবনে, অসুর-তরঙ্গের দ্বারা সে আহত-প্রতিহত হয়নি, কালসর্পের দংশনে মৃত্যুর কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। অভিমন্যু প্রেমিক নয়— তপস্বী, সে তপস্বী হোলো ভীষণের, অসুরের। কল্যাণময় শিবের গলায় শান্ত ভুজঙ্গের ভূষণ নয়,—রুদ্রের কণ্ঠে উদ্যত-ফণা কালসর্প লোলমান। অভিমন্যু চলেছে শিঙায় ফুৎকার দিয়ে ডমরুধ্বনির মধ্যে,—মৃত্যুকে ছড়িয়ে দেবে সে সর্বত্র, দুর্দশা ও দুর্যোগের আগুনে পোড়াবে সে সবাইকে, আনবে অগ্নিজ্বালা, বাধাবে মহারণ, ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করবে। কিন্তু তপতীকে হ'তে হবে অভিমন্যুর জীবনে সব চেয়ে বড় প্রতি-রোধ, অভিমন্যুর সর্বনাশা ধ্বংসের পথে তপতীকে হ'তে হবে দুর্লঙ্ঘ্য আর দুর্ভেদ্য মহাপ্রাচীর,—তা'র সমগ্র নারীশক্তির দ্বারা অভিমন্যুর বিরোধ শক্তিকে নিষ্ফল ও নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলতে হবে। তপতীকে ভুলতে হবে সে অভিমন্যুর প্রণয়িনী, সহধর্মিনী, সহচারিণী। একথা বোঝাতে হবে অভিমন্যুকে, আদিশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুইটি আধারে আশ্রয়লাভ করেছে। সেই শক্তির প্রতিকূল রূপ হোলো অভিমন্যু, অনুকূল রূপ হোলো তপতী। শক্তি একই,—কিন্তু এক চেহারায় সে হোলো রাজা রাবণ, অন্য চেহারায় রাজা রাম-চন্দ্র। দ্বিধাবিভক্ত সেই শক্তি একরূপে অন্য রূপকে আঘাত

করে। এই যে তপতীর দেহপট,—কী সুন্দর এর অক্ষত যৌবনশ্রী, কী শোভা এর অনাবৃত লাবণ্যের, কী নশ্বর পেলবতা এর প্রতি স্তবকের। এরই অন্তর-মন্দিরে রয়েছেন দেবতা অধিষ্ঠিত। শৈশব তারুণ্য যৌবন জরা বার্ধক্য,—তাঁর নানাবিধ আত্মপ্রকাশ। শৈশবে তাঁর লীলা, যৌবনশ্রীতে তাঁর আনন্দ, বার্ধক্যে তাঁর তপস্যা, মৃত্যুতে তাঁর সম্পূর্ণতা! প্রতি অনুকণা ধূলিকণা হোলো প্রাণবান,—সেই অনন্ত চৈতন্যের ক্ষুদ্রতম আধার। মানুষও তাই। তা'র এক বিন্দুবৎ চৈতন্য হোলো অনন্ত চৈতন্যের আসন। কিন্তু এই নিত্যক্ষয়িষ্ণু দেহের ভিতরেও অনুকূল-প্রতিকূল শক্তির কী অবিশ্রান্ত সংগ্রাম! অন্তর্যামী তা'র সাক্ষ্য। দেহের রণ-ক্ষেত্রের প্রত্যেক গ্রন্থি-স্থলে দুই দল বীজাণুর নিত্য সংঘাত আর প্রতিঘাত, জয়-পরাজয়ের অবিরাম কাহিনী লেখা চলছে। প্রাণশক্তির একই উৎস,—কিন্তু দুই দলের মধ্যে সেই শক্তি অনুপ্রবিষ্ট। বাইরেও তাই, বিশ্বপ্রাণের শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করেছে অভিমন্যু আর তপতীর মধ্যে। তারাও একই শক্তির দুই বিভিন্ন প্রকাশ। অভিমন্যু পরাজিত হবে কোন্ শক্তিতে? যমের কাছে তপতী যাবে কি অভি-মন্যুর প্রাণভিক্ষার জন্য? মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে কি অমৃত?

তপতীর বুকের ভিতরে ধক ধক ক'রে উঠলো! সামান্য মানবিকা সে! কোথায় তা'র সেই কঠোর তপস্যালভ্য দুর্লভ

শক্তি? সে-শক্তি কি আত্মিক প্রেমের? সে শক্তি কি তা'র চরিত্র-সততার, চিত্তশুচিতার, স্বভাব-সতীত্বের? প্রাণমন্দিরে সে কি প্রেমের পূত হোমাগ্নিকুণ্ড অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে? পেরেছে কি পবিত্রতম প্রেমের নৈবেদ্য উপচার সাজিয়ে রাখতে আপন অন্তর্যামীর চিরজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে? যদি পেরে থাকে, তবে ভয় নেই মানবিকার। সে রূপান্তর ঘটাবে অভিমন্যুর। অগ্নি আভাময় প্রেমের দ্বারা, প্রবলতর আত্মিক শক্তির দ্বারা, যোগাসনাসীন চিরকালীন ভারতের সাধনালব্ধ দেবত্বশক্তির দ্বারা,—সে আনবে অভিমন্যুর মধ্যে ভাবান্তর, সে দেখাবে পথ অভিমন্যুকে। দুঃসহ প্রেমের অগ্নি-শিখায় আত্মাহুতি দেবে সে,—সেই আগুনের আভায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে তা'র প্রিয়তম। বিরোধ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, বিকার, লজ্জা, অসঙ্গতি—সমস্তের উর্ধ্বে সমস্তের অতিক্রান্ত,—সর্বলোকাশ্রয়ী প্রেম, সর্বকালজয়ী আনন্দের মধুর সখ্যতা, তা'রই দ্বারা ঘটবে অভিমন্যুর পরিবর্তন, অভিমন্যুর নবজন্ম।

আত্মসমাহিত তপতী সচেতন হয়ে তাকালো পথের দিকে। পথ ফুরিয়ে গেছে। লক্ষ্মৌ শহর অতিক্রম ক'রে মোটর চলেছে গোমতীর তীর ধ'রে। বেলা তখন অপরাহ্ণ।

আর একটু পরেই গাড়ী এসে প্রবেশ করলো বেলাবনের বাগানে। খানসামার ছেলেটা কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো গাড়ীর দরজার কাছে। হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়ে বললে, মাইজি!

গাড়ী থেকে নেমে সহাস্যে তপতী ছেলেটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলো। বললে, কেমন আছিস? অসুখ সেরেছে?

ছেলেটা মাতৃভাষায় জানালো, অনেকদিন সেরে গেছে। সুতরাং বকশিস চাই।

দাই আর খানসামা সানন্দে এসে দাঁড়ালো। তপতী বললে, গাড়ীতে এক ঝুড়ি কমলালেবু আছে, দাও ত' মজনুকে? ওই ওর বকশিস।

আপিস ঘরে একরাশ চিঠিপত্র জমেছিল। সেইদিকে একবার তাকিয়ে তপতী শয়নকক্ষের দিকে চ'লে গেল। সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে সে বললে, দাই, বাতি বনা দেও… জল্‌দি…

তপতী ফিরেছে, এ খবর যথাসময়ে পৌঁছেছিল লক্ষ্ণৌর দপ্তরে। সকালের দিকে দুজন কর্মচারী কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে তপতীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রামজীবন ত্রিবেদীর অতিথিশালায় ব'সে তপতী যে সরকারী বিবরণগুলি প্রস্তুত করেছিল, সেইগুলি নিয়ে আলোচনা চললো অনেকক্ষণ। ভূঁইয়া জমিদারের সঙ্গে টিহিরির বিরোধের একটা মীমাংসা হয়ে গেছে, এও একটা সমস্ত সুসংবাদ ব'লে গভর্ণমেণ্ট মনে করেন। একখানা সরকারী পত্রে বলা হয়েছে, শ্রীমতী চৌধুরীর অসীম শ্রমস্বীকারের ফলে যে-জাতীয় সুযোগ লাভ করা গেল তা'র তুলনা কম। একদল জেদী জমিদারের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে এই প্রকার সাফল্যলাভের পরিচয় তিনি দিতে পেরেছেন, এজন্য গভর্ণমেণ্ট শ্রীমতী চৌধুরীর নিকট শুধু কৃতজ্ঞই নন্, তাঁর এই সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট বহুদিন অবধি তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন। অতঃপর জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সানন্দে ঘোষণা করছেন, এই বিভাগে শ্রীমতী চৌধুরীকে সর্বাধিনায়ক ও পরিচালকের পদে অদ্য তারিখ থেকে উন্নীত করা গেল। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অধীনে কার্য পরিচালনা করবেন। প্রকাশ থাকে, শ্রীমতী চৌধুরীর মন্ত্রণা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, এবং তাঁ'র স্বাধীন গতিবিধি ও কার্যকলাপের পথে সর্বপ্রকার সরকারি সাহায্য দান করা হবে।

কর্মচারী দুজন সানন্দে তপতীকে অভিনন্দন জানালেন, এবং তাঁদের সেই সশ্রদ্ধ ভাষায় তপতীর কর্ণমূল ঈষৎ রক্তাভ হ'য়ে উঠলো।

ঘণ্টা দুই ধ'রে ভদ্রলোক দুজন তাঁদের কার্যক্রম বুঝে নিয়ে এক সময় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কক্ষত্যাগ ক'রে গেলেন। অতঃপর তপতী দাইকে ডাকলো, এবং গাড়ী প্রস্তুত রাখতে ব'লে দিল। দুপুরের দিকে বিশেষ কাজে তা'কে বেরোতে হবে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা বাজে।

তপতী স্নান করতে চ'লে গেল।

আজ সকালে মায়ের মিষ্ট মধুর চিঠি পেয়ে তা'র মন

অতিশয় উৎফুল্ল ছিল,—তার পদোন্নয়নের সংবাদ অপেক্ষাও সেটি মূল্যবান। সুতরাং বাথরুমের ঝরো ঝরো জলের ধারার সঙ্গে সে গান ধ'রে দিল মধুর কণ্ঠে। মূল্যবান সাবানের ফেনা ও কেশ তৈলেব সুগন্ধে মিশে সেই মূর্চ্ছনাময় মিষ্ট কণ্ঠস্বর বাইরে এসেও সকলের কানে অমৃত বর্ষণ করলো। শাওনের মেঘের রং ধরেছ তুমি, হে শ্যাম, তোমাকে যদি পেতুম এই ঘোর ঘন তমসায়। গত রাত্রে তুমি এসে ফিরে গেছ, শ্রীমতীর প্রাণ গিয়েছে তোমার পায়ে পায়ে। সকল ভয় বাধা তুচ্ছ ক'রে শ্রীমতী যাবে আজ তোমার মন্দিরে। তা'র প্রাণে তোমার বাঁশী বেজে উঠছে বা'র বা'র!

খানসামার ছোট্ট ছেলে মজনু বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিল গানটা। তপতী বাইরে এসে তাকে সামনে দেখেই সাদরে তার কানটা ম'লে দিয়ে চ'লে গেল। ওঘরের থেকে বললে, হতভাগা, ফের পায়ে পায়ে ঘুরছিস আমাকে একটু আড়ালে থাকতে দিবিনে! আমার পায়ে দড়ি বাঁধবি নাকি বুড়ো বয়সে?

এদিক থেকে মজনু বললে, মাইজি, গাহানা বড়ে আচ্ছা!

তোর মুণ্ডু! কী আমাব রসিক শ্রোতা রে! বই কিনে দিইছি, যা পড়া করগে?

কাঁদো কাঁদো হয়ে মজনু বললে, যাতা হুঁ, মাই···

ছেলেটাকে বেশ লাগে। ওর মা-পোড়ারমুখী মরেছে শুধু তপতীকে জ্বালাবার জন্য! আর এক মা বহুকাল আগে

পথের ধার থেকে একটি মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছিল, সে-মেয়েটির নাম তপতী। সর্বালঙ্কার ভূষিতা জগজ্জননীর বেশে তাঁকে দর্শন করার বড় ইচ্ছা তপতীর। সে-ইচ্ছা তপতী পূরণ করবেই।

গাড়ী নিয়ে দুপুরে সে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রাদেশিক দপ্তরে তা'র কাজ ছিল অনেক। যে-কক্ষটি অতঃপর তা'র জন্য রক্ষিত রইলো, সেটির সাজসজ্জা তা'কে দেখে নিতে হোলো। কোনো কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে তা'র দেখা করার দরকার ছিল। ওই সময়ের মধ্যেই কমলের কথাটা সে ভোলেনি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলো কমল নেই। একটা ছোট্ট নোট রেখে সে আবার বেরিয়ে পড়লো।

বেলাবনে সে যখন ফিরে এলো তখন শীতের বেলা প'ড়ে এসেছে। পথে আসতে এক সিনেমায় চ্যাপলিনের কি যেন একখানা বই দেখানো হচ্ছিল। তপতীর বড় সাধ হোলো ছবিটি দেখার, কিন্তু একা যেতে তা'র সাহস ছিল না। তা'র চলাফেরার পথে অনেক সময়ে একটি কমলকে তা'র বড় দরকার।

গাড়ী রেখে অপিসঘরে গিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল সামনে কমল। তপতী বললে, বাঃ সারা লক্ষ্ণৌ তোমাকে খুঁজছি, তা জানো?

কমল বললে, এত সৌভাগ্য কেন আমার, বৌদিদি?

ও কি! ও কি ছেলেমানষী, কমল?

কমল নির্ভয়ে বললে, রাগ ক'রো না, তোমাকে এজন্মেই পেতে চাই। পরজন্মের সবুর আমার সইবে না, বৌদিদি!

কেমন একটা কম্পন অনুভব করলো তপতী সর্বশরীরে! অনেকটা যেন রোমাঞ্চ, অনেকটাই যেন হর্ষ। চেয়ারে বসে প'ড়ে সে বললে, ঝড়ের আগেই দৌড়লে? তোমার দাদাটি কে শুনি?

জানিনে। যদি সেই দাদার কোনোকালেও দেখা না পাই তবু তুমি আমার ভ্রাতৃজায়া,—আমার আদরের আনন্দের বৌদিদি!

তপতী বললে, আজ তোমার এই উচ্ছ্বাসের হেতু?

কমল বললে, তোমার পদোন্নতিতে লক্ষ্ণৌসুদ্ধ সবাই খুশি, আজ গেজেট্ হয়ে গেছে। সবাই জানাচ্ছে অভিনন্দন,—কিন্তু আমাব অভিনন্দন এই, এ তুমি মেনে নাও। তুমি আমার বৌদিদি!

তপতী বললে, বেশ, মেনে নিলুম। কিন্তু কমল, আমার জীবনে তোমার দাদা যদি কেউ না জোটেন? সিঁদুরের ফোঁটা কপাল অবধি উঠেছে যদি তা'ব চেয়ে উচুতে আর না ওঠে?

কমল বললে, সে তুমি জানো বৌদিদি, আমি নয়। আমি যা চেয়েছি তাই পেলাম। এই আমার সব চেয়ে লাভ। আমি ধ'রে নেবো চিরদিন তোমার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল, চিরদিন থাকবেও। জাতির ভাগ্যদেবতা হলেন সকলের স্বামী,

তিনি প্রভু। তিনি তোমারও স্বামী,—সকল স্বার্থত্যাগিনী দেশসেবিকারও। লৌকিক স্বামী তুমি যদি না গ্রহণ করো, আমি দুঃখ করবোনা, বৌদিদি।

দাঁড়াও আসছি—ব'লে তপতী নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল মুখ ফিরিয়ে। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটো কমলের কাছে না লুকোতে পারলেই নয়। অনেক সময় অহেতুক জলোচ্ছ্বাস আসে তা'র দুই পোড়া চোখে। তা'র ভিতরে কেমন যেন এক কাঙ্গালিনীর বাসা আছে, কোনো একটা খোঁচা কোনো এক তন্ত্রীতে বাজলে সে কাঙ্গালিনী বাইরের রাজরাণীকে সরিয়ে বেরিয়ে আসে।

সে যখন আবার এসে কমলের সামনে দাঁড়ালো, তার আলুলায়িত কেশপাশ,—এবং ঠিক মাঝখানের সিঁথিমূলে সিদুঁরের দীর্ঘ দাগ শিখার মতো যেন ধক ধক ক'রে জ্বল্‌ছে। কমল স্তব্ধ হয়ে রইলো কতক্ষণ। তারপর বললে, ও কি, বৌদিদি ?

হাসি মুখে তপতী বললে, কেন, এই ত' তুমি চাও, ভাই ?

কমল তাড়াতাড়ি উঠে এসে আভূমি নত হয়ে তপতীর পায়ের দুটি আঙ্গুল ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

এবার খুশি ?

এবার আনন্দিত।

বেশ, তাহলে এবার মিষ্টিমুখ করো।—এই ব'লে তপতী আবার চ'লে গেল ঘরের দিকে।

স্নান সেরে ঝরঝরে চেহারা নিয়ে আবার সে বেরিয়ে এলো। সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই, চুল ফিরিয়ে বাঁধা, যেমন-তেমন পরিচ্ছদ। সাধারণ মৃদুমন্দ চলন। তপতী বললে, বলো এবার, কি খবর!

কমল পকেট থেকে এক রাশি টাকা বার ক'রে তপতীর সামনে রাখলো। বললে, সকালেই তোমার এখানে আসতুম, কিন্তু তোমার সেই চিঠি নিয়ে গেলুম ট্রেজারীতে টাকা আনতে, তাই দেরী হয়ে গেল।

তপতী হেসে বললে, আজও জানিনে কত টাকা মাইনে পাই। বলো ত?

আমি জানবো কেমন ক'রে? টাকা ত' দেখি না চাইতেই আসে। তুমি ত' সেবার একরাশ টাকা ফেরৎই পাঠিয়ে দিলে!

তপতী বললে, বেশী টাকা কাছে রেখেই বা কি করবো? তাই দিলুম পাঠিয়ে। যাকগে। তারপর? আর সব খবর কি?

কমল বললে, আজ সকালের কাগজ দেখেছ?

না। কেন?

কলকাতার খবর ভালো নয়। শহরময় অগ্নিকাণ্ড, মারা-মারি, গুলী ছোড়াছুড়ি।

তপতী মনে মনে একটু চমকে উঠলো। বললে, কলকাতা কোনোদিন শান্ত থাকে না, ভাই। যখন ভারত ঘুমোয়,

কলকাতা জেগে থাকে প্রহরীর মতন, দরকার হলেই ডাক দেয়।

কমল উৎসুক হয়ে বললে, কেন বলো ত ?

এই হোলো কলকাতার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তা'র চেতনা, বুদ্ধি, চিন্তা, মস্তিষ্ক—অত্যন্ত প্রখর। সামান্য স্ফুলিঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, সামান্য হাওয়া থেকে আসে প্রবল ঝঞ্ঝা! ভারতবর্ষের বুদ্ধিতে আছে কিছু স্থূলতা, কিছু অসাড়তা, কিছু বধিরতা, কিছু বা দৃষ্টিহীনতা,—কিন্তু কলকাতা এর বিপরীত। অত্যন্ত ক্ষণ-মর্জী, অতিরিক্ত চটুল। ধনদৌলতের পাশে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পাশে মূর্খতা, অসাধুতার পাশে মহত্ত্ব, সৌন্দর্যের পাশে নোংরামি,—সমস্তগুলো পাশাপাশি বাস করে। চুরি ডাকাতি আছে সর্বত্র, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অভিযানও আছে সকল দিকে। ছেমেমেয়েদের দিকে তাকাও, অনেক সময় তাদের নির্লজ্জ নোংরামি লক্ষ্য ক'রে তোমার মাথা হেট হবে। কিন্তু যদি ঠিক মুহূর্তে ডাক আসে, দেখবে তারাই উঠে এলো কোমর বেঁধে মাথা উঁচু ক'রে যুদ্ধসজ্জায়—সে মহিমা দেখে তুমি অবাক হবে। বলো ত, কলকাতার মতো রক্ত পড়েছে কোথাও ? কলকাতার মতো মাথা উঁচু করেছে কেউ ? কলকাতার মতো নোংরায় ডুবেছে কোনো শহর ? আর কোনো শহর আদর্শের জন্য এমন আত্মোৎসর্গ করেছে কখনো ? কলকাতার নাড়ি টিপলে ভারতের দেহ-চৈতন্য অনুভব করা যায়। বাঙালীর প্রাণশক্তির অধীরতাই কলকাতাকে অশান্ত ক'রে রাখে।

কমল হাসিমুখে বললে, কখনো কলকাতায় যাইনি, কিন্তু তোমার কথায় তা'র ছবি খুঁজে পাই। দুদিন আগের খবর নাকি খুব খারাপ, ধরপাকড় চলছে চারিদিকে। ছেলেমেয়েরা জেলে গিয়ে নাকি উপবাস করছে।

তপতীকে আর বেশী কিছু বলবার দরকার করে না, চিন্তিত মুখে সে চুপ ক'রে রইলো। এক সময় সে বললে, বাঙলার অসুখ হোলো আন্তরিক, রক্ত দূষিত। ভালো চিকিৎসা না হলেই চলবে না।

কমল টেবলের উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে বললে, এই দেখো না. এতেই পাবে। তিনের পাতায় :খবরগুলো আছে।

খবরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় এসে তপতীর দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়ালো। জনৈক পলাতক বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগ এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে করতে যায় মধ্যপ্রদেশের ছোট এক শহরে। কিন্তু লোকটি অবশেষে খড়্গপুরে এসে গ্রেপ্তার হয়। সে নাকি তরুণ সমাজের এক বিশিষ্ট নেতা। নাম—অভিমন্যু রায়। এই ব্যক্তি নাকি আন্তঃপ্রাদেশিক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের সরকারী মহলের কোনো কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এই ব্যক্তির যোগাযোগ আছে। গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করছেন।

কমল বললে, কী পড়ছ ওটা, বৌদিদি ?

তপতী মুখ তুলে তাকালো। জবাব দিল না।

কমল পুনরায় বললে, তোমার শরীরটা আজ বোধ হয় ভালো নেই, না ?

বোধ হয়।—তপতী ঠিক যেন ককিয়ে উঠলো।

কমল বললে, কিন্তু টাকাগুলো তোমার গুণে নেওয়া দরকার।

অসাড় আঙ্গুলে তপতী টাকা গুণতে আরম্ভ ক'রে দিল।

কমল বললে, বৌদিদি, মনে রেখো—এবার কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি কলকাতা যাবো। ওকি, গুণছো না যে ?

তপতী উঠে দাঁড়ালো। বললে, ঠাকুরপো, তোমার পরীক্ষায় পাস হ'তে পারলে সুখী হতুম, ভাই। কিন্তু আজ আমাকে ছুটি দাও।

কীসেব পরীক্ষা, বৌদিদি ?

টাকা নিচ্ছি কিন্তু গুণতে ব'লো না।—এই ব'লে নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে তপতী টলতে টলতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তাকালোনা পিছনে।

অসুস্থ বোধ করেছিল তপতী গতকাল সন্ধ্যায়, সন্দেহ নেই। মনে হয়েছিল আলোটা বোধ হয় নিবেই গেল। দুশ্চিন্তা নয়, বেদনাবোধও নয়—কিন্তু প্রবল অস্বস্তিতে রাত কেটেছিল। ইংরেজ শাসন কালে কারাগারে যাওয়াটা বাহ্যতঃ ছিল আনন্দের, বস্তুত ছিল আক্রোশের। তখন

মনে হোতো অশান্তি এবং সমস্যা এনে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেবো শাসনকার্য, নিশ্বাস নিতে দেবোনা রাজশক্তিকে, তখন কারাগারে যেতে পারলে নিজের সম্বন্ধে কেমন যেন শ্রদ্ধা ও মহিমা খুঁজে পাওয়া যেতো। কারাগার ছিল অনেকটা যেন তপশ্চর্যার নিরিবিলি ক্ষেত্র।

সকাল বেলা উঠে পাইন-পপলারের বাগানে এসে তপতী দেখলো অতি মধুব জ্যোতির্ময়তা। শিশিরের শোভা সূর্যাভায় প্রতি তৃণফলকে উচ্ছলিত। আকাশ মুখর ক'রে ডেকে চলেছে স্বচ্ছন্দচারী পাখীর দল। আশপাশে শান্ত পল্লীশ্রী। আজ সকালে তপতীর আর কোনো মনোবিকার নেই। এখন ইংরেজ শাসনের কাল নয়। কথায় কথায় মারমুখী হওয়া বেমানান। অনেক দুঃখে পাওয়া গেছে মুক্তি, অনেক দুঃখ পেলেও সেই মুক্তিকে বিপন্ন করা চলবে না!

অভিমন্যু যে পলাতক অবস্থায় তা'র কাছে এসেছিল, একথা তা'র কাছে অভিমন্যু গোপন রেখে গেছে। তপতীর কাছে একথা সে প্রকাশ করতে পারতো, কিন্তু করেনি। তপতী তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তপতী সরকারি মহলের লোক। বরং সে নিয়ে যেতে এসেছিল তপতীকে ছিনিয়ে। কোথায় নিয়ে যেতো? নিয়ে যেতো গোপন আনাগোনায়, কোনো একটা কুমন্ত্রণায়। অসন্তোষকে ফুৎকার দিয়ে জাগানো,—ফলে আক্রোশ, ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইংরেজ স'রে গিয়েছে, কিন্তু ইংরেজ বৃত্তিসম্পন্ন এদেশী এক সম্প্রদায়

র'য়ে গিয়েছে। তারাও নিঃশক্তি হবে একদিন—সেদিন আগত। সমবণ্টনব্যবস্থা না করলে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য, একথা শিশুও জানে। কিন্তু বিদ্বেষ কেন? কেন ষড়যন্ত্র? রাজপথে আগুন জ্বালাবার এ হিড়িক কেন? যানবাহনগুলো নষ্ট করার কেন এই হুজুগ? নিজের কপাল ঠুকে রক্ত বা'র করা, সেই রক্ত হাতে মেখে অশিষ্ট নাবালক দলের পৈশাচিক উল্লাস!

অভিমন্যু তা'কে বিশ্বাস করেনি, এটা বিস্ময়কর, বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিশ্বাস করলে তপতী কি তাকে বলতে পারতো, অভিমন্যু, আমার কাছে তোমার জায়গা নেই? তা নয়। আসলে অভিমন্যু নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারে না। দেশ অপেক্ষা তা'র কাছে বড় রাজনীতি, হৃদয় অপেক্ষা বড় বুদ্ধি, ভালোবাসা অপেক্ষা চুক্তি। তপতীর কাছে অভিমন্যু যত বড়, নিজের কাছে অভিমন্যু ততই ছোট নয় কি? যেখানে তা'র সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের দাবি, সেইখানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংশয় রেখে চ'লে গেল।

দুঃখ নেই তপতীর, কেননা দুঃখকে সে অতিক্রম করেছে। একদা তা'র নিজেরই মনে হয়েছিল, আরামের লোভেই সে কি দুঃস্থ অভিমন্যুকে ছেড়ে এসেছে? সে কি অবিচার ক'রে এলো তা'র জীবনরথের সারথির ওপর? কিন্তু সে-সংশয় তা'র ঘুচেছে অনেক ভাবনার পর। সে আরাম চায়নি, চেয়েছিল কাজ। কাজটাকেই যদি বড় ক'রে তোলা

যায়, তবে আরামের আকর্ষণ আপনা থেকেই খ'সে পড়ে। আসল কথা, কিছুতেই লোভ করা চলবে না। এ যুগে সব চেয়ে বড় পরীক্ষা লোভকে জয় করার। অভিমন্যুরা সমাজের কাঠামোটাকে ভাঙ্গতে বসেছে আক্রোশের সঙ্গে, ভাঙ্গতে বসেছে বিদ্বেষের দ্বারা—কল্যাণ বোধের দ্বারা নয়। তপতীর প্রতিবাদ সেইখানে। ভাঙ্গছে যারা, তা'রা কী চায়—কেউ বলে না। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক ভেঙ্গে ফেলতে হবে—এটা উন্মত্ততার কথা। ভাঙ্গনের কাজে যারা নেমেছে, তাদের চরিত্রের কথা ওঠে। কে তা'রা? তা'রা কি এ যুগের কাছে পরীক্ষা দিয়েছে সততার আর সাধুতার? তা'দের নৈতিক শুচিতা? তা'দের চরিত্রের দৃঢ়তা? তাদের সর্বদর্শী বিদ্যা, আর সংস্কৃতি? এগুলোর পরীক্ষা হয়েছে কি? দেশের সামনে তাদের কল্যাণকর্মের কোনো সাক্ষ্য আছে? তাদের কর্মসূচীর প্রতি সমাজনীতিক আদর্শের কোনো সম্মতি আছে? যেমন ক'রে হোক ভাঙ্গতেই হবে—এটা ভাঙ্গনেব মোহ, এটা হুজুগ, এটা অশিষ্ট মনোবৃত্তি! ঘর ভাঙ্গতে পার না—কেনন৷ সেটা তোমার আশ্রয়। বিদ্যামন্দিরকে ভাঙ্গতে পারো না, কেননা সেখানে তোমাকে ব'সে মনুষ্যপদবাচ্য হ'তে হবে। পিতামাতাব সম্পর্ককে ভাঙ্গতে পারো না, কেননা সেটা তোমার সামাজিক পরিচয়। তুমি চেঁচিয়ে কি বলতে পারো, তুমি পিতৃ পরিচয়হীন পতিতার সন্তান? যদি না পারো, বুঝবো তুমি সামাজিক আর নৈতিক

আদর্শ মানো। চেঁচিয়ে কি বলতে পারো, তুমি সিঁধেল চোর ? ঘোষণা করতে পারো কি, নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে তোমার নিষিদ্ধ অবৈধ সংসর্গ ? পারো কি বলতে যে, তোমার এক নিরীহ প্রতিবেশীকে নিয়মিত প্রতারণা ক'রে চলেছ ? পারো কি তোমার প্রিয় সন্তানটির গলায় দড়ির ফাঁস টেনে হত্যা করতে ?

অনেকগুলো কাজ তুমি পারো না। অর্থাৎ সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের মূলনীতি তুমিও রক্ষা করতে চাও। তবে আজ কী ভাঙ্গতে বসেছ ? অভিমন্যু ভাঙ্গতে বসেছে অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও কুশাসননীতি। খুব ভালো কথা। তা'হলে একটু সবুর করো। কুশাসনকে যারা ভাঙ্গতে চায়, তা'রা কে ? তা'রা এসে দাঁড়াও সামনে। বিশাল ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষকেন্দ্রে যারা এসে বল্‌গা ধর-বেন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, প্রতিভা, দক্ষতা,— এতগুলি বস্তুর প্রশ্ন আসে। ইংরেজ আমলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে তোমরাই তাড়িয়েছ। কিন্তু আজ যাঁরা শীর্ষ-স্থানে রয়েছেন, তাঁদেরকে সরিয়ে নতুন মানুষ তোমাদের মধ্যে আছে কয়জন ? দেশের কোটি কোটি লোক তাঁদের চেনে কি ? যোগ্যতার পরীক্ষা তাঁদের হয়েছে কি ? জন-গণের নৈতিক সমর্থন তাঁরা কি পেয়েছেন ?

অভিমন্যুদের মধ্যে কোথায় হয়েছে নতুন সৃষ্টি ? কোথায় ডানা বেঁধে উঠেছে নতুন কাজ আর নতুন জীবনের একটা

কাঠামো ? অভিমন্যুরা বই পড়েছে অনেক, কল্পনা করেছে তা'র চেয়েও বেশী। বুলি ধার করেছে নানা দেশ থেকে, ষড়যন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করেছে নানা নক্সা মিলিয়ে। এক দেশের ক্ষুধাতুর দরিদ্র সাধারণ চায় অন্ন, চায় শক্তি, চায় ক্ষমতা ; আর এক দেশের বুভুক্ষু দরিদ্ররা অন্নেব চেয়ে বড় ক'রে দেখেছে ধর্মকে, শক্তির চেয়ে মনুষ্যত্বকে, ক্ষমতার চেয়ে কল্যাণবুদ্ধিকে। ভারতের স্বভাব হোলো ধর্মচেতনা, অন্যদেশের স্বভাব হোলো কর্মচেতনা। খাওয়ার জন্য বাঁচা এ শিক্ষা অন্যদেশের ; বাঁচার জন্য খাওয়া—এই শিক্ষা ভারতের। ভারতে একদিন সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য ছিল প্রচুর, আহার্য ছিল প্রচুরতর,—কিন্তু ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে সে ছোটেনি অপর দেশকে কুমন্ত্রণা জোগাতে। অন্নবস্ত্র জুগিয়েছে ভারত সকল দেশে সকল কালে। আশ্রয় দিয়ে এসেছে সকল জাতিকে, সকল ধর্মকে, সকল চিন্তাধারাকে,—কিন্তু তা'র পরিবর্তে রাজনীতিক সুবিধা সে চায়নি। সে চেয়েছে সকল দেশে আত্মিক শক্তির উদ্বোধন, সে চেয়ে এসেছে মনুষ্যত্ব-ধর্মের সর্বব্যাপী জাগরণ।

গতকাল সন্ধ্যার থেকে সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি তপতীকে চারিদিকের নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু আজ সকালে সত্যই তা'র চিহ্নমাত্র নেই। যত ঘন হয়েছে অন্ধকার, আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের সম্ভাবনা ঘটেছে ততই বেশী। নিজের ভিতর থেকেই আনন্দের সন্ধান সে

পেয়েছে সন্দেহ নেই। তিন বছর আগে ঠিক এমন দিনে মনে হয়েছিল, বোধ হয় অন্ধকার কাটবে না, বোধ হয় পথ আর পাওয়া যাবে না, চারিদিকের বিষাক্ত বাষ্পে কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল,—সেই দুষ্টশক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবার কোনো সম্ভাবনাই আর ছিল না। কিন্তু সেই লগ্ন ত' দাঁড়িয়ে নেই! অবশেষে আলো ত খুঁজে পাওয়া গেল!

কিন্তু আজকের অন্ধকার গভীরতর। তা হোক, আজকে আর ভয় করবে না। সেদিন রাজশক্তির সঙ্গে দুষ্টশক্তি হাত মিলিয়ে প্রজাশক্তিকে পঙ্গু করার পন্থা খুঁজেছিল, কিন্তু আজকের সংঘর্ষ অন্য চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যা আর পাণ্ডিত্যের ছলনায় এসে দাঁড়িয়েছে অবিদ্যা আর নিরীশ্বরবাদ, ন্যায়শাস্ত্রের ছলনায় এসে দাঁড়িয়েছে মূঢ় অন্ধতা আর অবিশ্বাস। কিন্তু আজ তপতীর আর ভয় নেই। সে পেয়েছে, যা এতকাল ধ'রে ভারতের পাবার কথা ছিল। অসুরশক্তি রাবণ ত্রিভুবন জয় ক'রে তাদেরকে বশীভূত ক'রে ফিরেছিল,—কিন্তু পরাজয় ও অপমৃত্যু ঘটেছে তা'র এইখানে, এই ভারতে! এই ভারতের আত্মিক শক্তির অভিনব প্রকাশ—তা'র দেখা মিলতে আর বিলম্ব নেই; ভারত-আত্মার মূর্তিকে দর্শন করবে তপতী তা'র এই দুই চর্ম-চক্ষু দিয়ে—তারও আর বিলম্ব নেই।

নিজেকে বড় স্বচ্ছ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র মনে হ'তে

লাগলো তপতীর। উৎফুল্ল আনন্দে কিশোরী বালিকার মতো সে দিন-তুই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ঠিক এমনি সময়ে এলো অভিমন্যুর সংবাদ ঃ

বেদেনি, তোমার বিশ্বাস আমার অপমৃত্যু ঘটেছে। আমিও বিবর্তনবাদকে বিশ্বাস করি, কেননা আমি বিজ্ঞানের যুগে মানুষ। যেটা বিবর্তন, সেটাই বিপ্লব। লক্ষ বছর আগেকার ভারত, আর আজকের—এ তুইয়ের মাঝখানে পুরুষ-পরম্পরাগত ভাববিপ্লব ঘটে এসেছে, তাকেই বলো বিবর্তন। বিপ্লব ছাড়া কোনো সমাজের প্রগতি ঘটেনি, —যেমন মৃত্যু ছাড়া জীবন অগ্রসর হয় না। লক্ষ বছরের মধ্যে এই ভারতে কোনো মানুষের মৃত্যু যদি না ঘটতো তবে তুর্ভোগ্য হোতো আজকের জীবন। কিন্তু মৃত্যু আছে ব'লেই জীবন এত সহনীয়। মৃত্যুই হোলো বিপ্লব। কোনো যুগের বিপ্লব হোলো মৃত্নগতি—বহু মানুষের মিলিত ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তা'র রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি বেশী দূর অবধি পৌঁছয় না, কেননা গতি তা'র মৃতু। আজও সেই বিপ্লবের নিশানা এসেছে মানুষের মনে। এযুগের স্বল্পায়ু মানুষ দ্রুতগতি বিপ্লবের কামনা করছে—এইটি তোমাকে সেদিন বোঝাতে পারিনি। স্তূপাকার জঞ্জাল জমে এসেছে শতাব্দির পর শতাব্দি, মানুষ রুদ্ধশ্বাস, রাজবুদ্ধি পঙ্গু, জীবন বিড়ম্বিত, সমাজ নিরুপায়—এমন সময়

সেই রথচক্রঘর্ঘরধ্বনি কাণ পেতে শোনো। তোমার মতো আমিও সেই প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিগণের বংশধর,—কিন্তু কি ভাগ্য, আজ তাঁরা বেঁচে নেই। থাকলে গাছের ফল আর নদীর জল ছাড়া আর কিছু জুটতো না! তোমার-আমার পিতৃপুরুষ প্রেতলোকে ব'সে আছেন হা প্রত্যাশায়,—কেননা একমুঠো চালের ভাত ফোটালে তবেই তাঁদের পিণ্ড জুটবে।

তামাসা এখুন থাক্। তোমাকে আনতে গিয়েছিলুম আমার সহধর্মিনী করবার লোভে নয়, তোমাকে মরণসঙ্গিনী করবো এই আনন্দে। বর্তমান যুগে একটা বিশাল মানবতা সার্থকতার একই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে তুমি আমি সামান্য, গণজনমনটাই বড়,—আশ্চর্য্য তা'র সমষ্টিগত প্রাণ, আশ্চর্য তা'র শক্তি। তুমি পাছে সেই প্রগতির পথ থেকে পিছিয়ে পড়ো সেই ছিল আমার উদ্বেগ। সবাই এগিয়ে যাবে একটা বলিষ্ঠতর নবচেতনাময় সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠার পথে—আর তুমি থাকবে পিছিয়ে হরিনামের ঝুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতের বীজমন্ত্র নিয়ে—সেটা আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। এর চেয়ে মরণ ভালো, এমন কি এর চেয়ে আমার মরচে-ধরা ভোঁতা তরোয়ালের বিপ্লবও ভালো। প্রাচীন ভারতের একটা সুবিধা ছিল এই, তারা বাঁচতে জানতো। কিন্তু তোমরা জানো কেবল মরতে। অন্ধকারেই মানুষ ভূতের পদচারণা

লক্ষ্য করে, প্রেতের আনাগোনায় শিউরে ওঠে, বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা দেখিয়ে শিশুদের ভয় দেখায়,—কিন্তু সূর্য দেখা দিলেই সব মিথ্যা হয়ে যায়। ভারতবর্ষের এই ঘন অন্ধকারে তোমরা ব'সে ব'সে সবাইকে দেখাচ্ছ প্রাচীন ভারতের প্রেতাত্মার পদচারণা, কিন্তু প্রাচ্যের আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে, তোমাদের সব জল্পনা-কল্পনাই মিথ্যা ব'লে শীঘ্রই প্রমাণিত হয়ে যাবে। তোমরা হাস্যাস্পদ হবে সকলের কাছে। মিথ্যা আত্মপ্রতারণার পথ ত্যাগ করো, এসে দাঁড়াও রূঢ় সত্যের মাঝখানে। আমি এগিয়ে চলেছি, জীবন সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিতে চাই।

গান্ধীজি তাঁর অপমৃত্যুর ঠিক আগে যে-বাণী উচ্চারণ ক'রে ছিলেন, তার কথা স্মরণ করো। তিনি বলেছিলেন, এ স্বাধীনতা তিনি চাননি; বলেছিলেন, চারিদিকের বিষবাষ্পে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, জীবনের প্রতি তাঁর আর কোনো মোহ নেই, এখন ভগবান তাঁকে দয়া করুন। মনে কি পড়ছে তোমার, বেদেনী? বিনা রক্তপাতে এত বড় দেশের কায়িক মুক্তি যিনি আনলেন তাঁর জীবন-সাধনায়, শেষের দিনগুলিতে তিনি জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেলেন, সে কা'দের অপরাধে? এতকাল ধ'রে যারা ছিল তথাকথিত সবত্যাগী দেশসেবক, রাতারাতি তাদের সর্বগ্রাসী লোভ মুখব্যাদান ক'রে উঠলো! সেই লোভ হোলো ক্ষমতার, প্রভুত্বের, স্বার্থের, চক্রান্তের। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াতে

চেয়েছিল, দুর্নীতির তলায় তা'রা তলিয়ে গেল। যাদের পরে সব চেয়ে বেশী ভরসা ছিল 'দেশের,—গান্ধীজি সমাদর ক'রে যাদের বলতেন, এরাই হোলো জাতি,—তাবাই চলেছে সব চেয়ে বেশী প্রতারণার পথে। জানি পৃথিবীর সব দেশেই আজ দুর্দিন, সকল জাতিই আজ দুর্দশাগ্রস্ত,—কিন্তু ভারতের প্রতিজ্ঞা ছিল সবচেয়ে বেশী। তোমরা ধার্মিক, ত্যাগী, নীতিপরায়ণ, সত্যব্রতী, অহিংস—এই সব কথা শুনিয়ে এসেছ বহুকাল থেকে। আজকে যেই তা'র প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ, অমনি তোমাদের পরাজয়। একদিন আমি কি ছিলুম ভেবে দেখো। কখনও মাথা ঘামিয়েছি অর্থনীতি নিয়ে? কখনও নিন্দা করেছি নেতাদের? দেশকর্মীদের বিরুদ্ধে কখনও অপযশ বরদাস্ত করেছি? কায়মনোবাক্যে কখনও প্রকাশ করেছি বিরোধিতা? কখনও সংশয় প্রকাশ করেছি কোনো নির্দেশের প্রতি? একথা কখনো উপলব্ধি কবেছ আমি স্বার্থোদ্ধারের লোভে নেমেছি দেশের কাজে?

রাগ করোনা, বেদেনী। ইংরেজকে সরিয়েছ, কিন্তু ইংরেজ-গুরুকে ভুলতে পারোনি। যে-আইনগুলো অনুসরণ করছ, এবং যে-আইনগুলো বানাতে বসেছ,—সেগুলোর কোনো-টাই ভারতীয় ছাঁচে তৈরী নয়। আইনের সেই ফাঁদ,—সেই কূটতর্কজালের ফাঁক দিয়ে প্রকৃত অপরাধীরা বেরিয়ে পালায়, তার বাদীরা হয় বিব্রত। দেশে খাদ্য নেই, কিন্তু

ধনবানদের ঘরে খাদ্যের অপচয় দেখে এসো। দেশে বস্ত্র নেই, দেখে এসো মিল-মালিকদের কোটি কোটি টাকা লাভের অঙ্ক! আশ্রয় নির্মাণের মাল-মস্‌লা কেনবার সম্মতি তুমি পাওনা,—কিন্তু দেখে এসো দিল্লী আর বোম্বাই আর কলকাতাব পথে পথে,—কত মাল মসলা তুমি চাও চোরাবাজারে? একদিকে বেড়েছে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা, অন্যদিকে বেড়েছে ধনীর সংখ্যা। ভোগবিলাস কত বেড়ে উঠেছে দেখেছ? খাদ্যপ্রাণের অভাবে কত অপমৃত্যু ঘ'টে চলেছে তোমাদের আমলে, দেখতে পাচ্ছ কি? খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় আন্তঃপ্রাদেশিক চক্রান্তের খবর কি তোমার কানে ওঠে না? বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থায় পশ্চিম ভারতের ক্রোড়পতিরা কি তোমাদের কাছে আস্কারা পেয়ে দেশের কল্যাণকে তুড়ি মেরে ওড়াচ্ছে না? শোনো বেদেনী, সেদিন একজন গভর্ণর কয়েকজন সাংবাদিক ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, আপনারা রটনা করেন যে, চোরাকারবার, দুর্নীতি আর ঘুষ খাওয়ায় চারদিক ভ'রে গেল—কিন্তু কই, সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে অপরাধীকে ত' কেউ ধরিয়ে দেন না? যদি সত্যকার অপরাধী ধরা পড়ে, তবে উচ্চ নীচ নির্বিশেষে আমরা তাকে ফাঁসী দিতে রাজী আছি!

হাসলুম তাঁর কথায়, কেননা কথাটা হাস্যকর। পুলিশের খরদৃষ্টি সামান্য শ্রমিক নেতার ঘরকন্নার খবর রাখে, পুলিশের বেড়াজালে পুঁটি মাছটি অবধি ধরা পড়ে,—আর

তাঁরা রুই কাৎলার বেলায় খবর পান্ না। ইংরেজ গভর্ণরদেরও এই নীতি ছিল। সহজে তাঁরা কথা বলতেন না, কিন্তু দেশের কোলাহল যখন চরমে উঠতো, তখন তাঁরা সরল ঔদাসীন্যের সহিত ওজনকরা বুলি উচ্চারণ করতেন। আসল কথা কি জানো? পুলিশের সবাই জানে প্রত্যেক মন্ত্রীর হাঁড়ির খবর, প্রত্যেক মন্ত্রী জানে পুলিশের কায-কলাপ। এক এক মন্ত্রী এক এক দলের অধিপতি,—সেই দলের স্বার্থরক্ষী তিনি হন্, নৈলে তাঁর আসন টলমল করে। কয়েকজন লোভী তাঁবেদারকে তুষ্ট করা চাই, একদিন যে-সব ভক্ত ভোট কুড়িয়েছে তা'রা তুষ্ট থাক্, নিন্দুকরা তুষ্ট থাক্, আত্মীয়পরিজন তুষ্ট থাক্, পুলিশের কোনো কোনো কর্মচারী তুষ্ট থাক্ এবং সবচেয়ে বড় কথা—আমার আখেরটাকেও গুছিয়ে নিতে হবে! ইংরেজ আমলে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি, কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করেছি,—বাকি জীবনটা যদি গাড়ীবাড়ী নিয়ে একটু সাচ্ছল্যে থাকতে পারি, সেটাই বা এমন কী অন্যায়! তাছাড়া দেশের মতিগতি ভালো নয়, এরপরে আবার যে গদী পাবো, সে ভরসা কম। আপাতত বেনামীতে কিছু সম্পত্তি কেনা যাক, এবং বেনামীতে কিছু টাকা বিশ্বাসী ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ক'রে রাখা যাক্।

বেদেনি, এ আমার ঈর্ষার কথা নয়। এই হোলো এখন সাধারণ মনোবৃত্তি তোমাদের দলের। তোমাদের দলে এখনও যে কয়জন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি আছেন, তাঁরা প্রায়

প্রতিদিনই তোমাদের এই অসাধুতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তোমরা যাদেরকে এতকাল ধ'রে আশ্বাস আর স্তোকবাক্য শুনিয়ে এসেছ, তিরিশ বছর ধ'রে ব'লে এসেছ, স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নবস্ত্রে দেশের সব ঘর ভ'রে যাবে, দুধ আর মধু গড়িয়ে যাবে দেশময়, তা'রা আজ তোমাদের অদ্ভুত চেহারার বিচার করতে বসেছে। তোমরা আজ অনেক উঁচুতে উঠেছ ব'লেই সকলের চোখ পড়েছে তোমাদের দিকে। ভুলে যেয়ো না, তোমাদের আচরণই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে। শাসন ব্যবস্থায় তোমাদের যত অপটুতা প্রকাশ পেতে থাকবে, আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ততই বেড়ে চলবে। ইংরেজনীতির উত্তরাধিকারী তোমরা, ইংরেজ-দক্ষতার নয়। একদিন আসমুদ্র-হিমাচল এই ভারত তাদের নখদর্পণে ছিল, তা'রা বেঁধে রেখেছিল ভারতকে কঠিন বন্ধনে। তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী তারা চিনতো এ দেশকে। একহাতে তা'রা শোষণ করতো, অন্য হাতে সব চেয়ে সস্তায় সব চেয়ে নীচের স্তরে ভাত-কাপড় পৌঁছে দিত। অর্থনৈতিক অভাব ছিল সেদিন প্রবল, কিন্তু অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল দেশেরই হাতে। আজকে রাজ-পথের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে অতি সাধারণ এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করো, সে বলবে, ইংরেজ আমল অনেক ভালো ছিল। কেননা প্রাত্যহিক জীবন যাপনের চেহারাটা এমন সাংঘাতিক জটিল ছিল না, কঠিন দুর্দশায় ব্যক্তিগত জীবনটা এমন

নৈরাশ্যে আর অশ্রুতে ভ'রে ওঠেনি। যাও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে। প্রশ্ন করো প্রত্যেকটি শিশুকে আর নারীকে, প্রশ্ন করো প্রত্যেকটি শ্রমিককে। তা'রা কি খায়, কেমন ক'রে বাঁচে, কি ভাবে দিন চালায, কি প্রকারে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করে, কেমন ক'রে সামাজিক জীবন যাপন করে। নগরের রাজপথ শুধু দেখোনা, যাও গলি-ঘুঁজিতে, পাড়াপল্লীতে, যাও বস্তিতে, যাও হাটে বাজারে।—যদি চোখ থাকে, দেখে নাও। যদি হৃদয় থাকে, বুঝে নাও। ইংরেজ যখন প্রথম এদেশে পৌঁছেছিল, তখন তা'রা এনেছিল দুর্ভিক্ষ; ইংরেজ সেদিন যখন চ'লে গেল, রেখে গেল দুর্ভিক্ষ। প্রথম দুর্ভিক্ষের কারণ—লোভ; দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের কারণ—লুণ্ঠন। কিন্তু মাঝ-খানে তা'রা দুর্ভিক্ষ আনেনি—কেননা নির্ভাবনায় ব'সে দেশের দেহেব রক্তশোষণেব দরকার ছিল। নিজেদের শাসনযন্ত্রেব সুবিধার জন্য তা'রা মধ্যবিত্ত সমাজকে তুষ্ট ও সুস্থ রাখার চেষ্টা করেছিল। শাসনযন্ত্রের সূক্ষ্ম কলা-কৌশল নিখুঁৎ না হলে দেড়শো বছর ধ'রে বিদেশের মাটিতে তা'রা টিঁকে থাকতে পারতো কি? তোমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছ, ইংরেজী বক্তৃতা দিয়ে। ইংরেজের আইন নকল করেছ ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু কই, ইংরেজদের রাষ্ট্রশিক্ষা গ্রহণ করোনি ত? ইংরেজের রাষ্ট্রচেতনা, নিয়মানুগত্য এবং তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক সততা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু শিক্ষালাভ করলে তোমরা যে অনেকখানি উপকৃত হ'তে পারতে!

একদিন আমি মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক ছিলুম। সত্যবাদ ও অহিংসায় তোমাদের কারো চেয়ে কম ছিলুম, একথা মনে করিনে। কিন্তু আজ আমার কপালে কলঙ্ক মাখিয়ে তোমরা বলছ, আমি নাকি দেশদ্রোহী, জাতির শত্রু। কিন্তু রাতারাতি আমার এই ডিগবাজির কী কারণ থাকতে পারে? ষাট বছর অবধি তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ চাপা ছিল; গত দু'বছরের স্বাধীনতায় তোমাদের যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি,—দশ বছরে তোমরা আমাদের কোন্ নরকে টেনে নিয়ে যাবে? সইতে কি পারো নিজেদের সমালোচনা? পারো কি সইতে তোমাদের কলঙ্ক প্রকাশের কাহিনী? পারো না! তাই দমন-আইনের এত হুড়োহুড়ি লাগিয়েছ নগরে নগরে, জেলায় জেলায়। সমালোচক আর বিরুদ্ধবাদীর কণ্ঠে পাছে সত্যভাষণের ঝলক ঝলসে ওঠে, সেইজন্য তাদেরকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে ইংরেজের মতো তোমরাও আনতে চাও না; সেইজন্য তাদেরকে সরিয়ে দিতে চাও লোকচক্ষের অন্তরালে।

গান্ধীজির দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। দূরের ইংরেজের সর্বপ্রকার চাতুরী আর কুটিলতা ছিল তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু কাছের বহু সহকারীর চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা তিনি স্পষ্ট দেখতে পাননি। অনেকে সর্বত্যাগ করেছিল চূড়ান্ত ভোগ বিলাসের কল্পনায়। অনেকে তাঁর বিশ্বাস উদ্রেক ক'রে গদীলাভ করেছে। অনেক ছলনাময় ব্যক্তি তাঁর মন ভুলিয়ে আশীর্বাদ আদায় করেছে,—সেই আশীর্বাদ সোনার ওজনে

বিক্রি ক'রে হয়েছে ধনপতি। অনেক তস্কর তাঁকে প্রতারিত ক'রে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছে। অনেক ধনপতি এক লক্ষ টাকা জাতীয় ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়ে তোমাদের গভর্ণমেণ্টের কাছে এক কোটি টাকার সুবিধা আদায় করতে চেয়েছে! সেই বৃদ্ধ সর্বত্যাগী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যখন কিষাণ-মজতুর-প্রজাদের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করতেন, তোমরা আড়ালে হাসতে মুখ টিপে। তোমাদের এই বক্র হাসির প্রমাণও আছে। গান্ধীজি যখন বললেন, কন্‌ট্রোল তুলে দাও,—তোমরা বলেছ, উনি সবল স্বভাব সাধু ব্যক্তি, অর্থনীতি শাস্ত্র ওঁর জানা নেই! আজকে সব প্রদেশে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে, জানো বেদেনী? যদি কোনো সজ্জন ভদ্রলোক শ্রদ্ধার সঙ্গে শাদা খদ্দরের টুপি মাথায় দিয়ে কোনো সভায় যান্‌, তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং নিন্দার ভাগী হন্‌। চৌর্যবৃত্তির সুবিধার জন্য গান্ধীজির আশেপাশে একদল খদ্দরের টুপি-পরা লোক ঘুরে বেড়াতো; আজ যখন সেই চাতুরী ধরা প'ড়ে যাচ্ছে, তখন তোমাদের দলের তারাই আবার টুপী খুলে অন্য চেহারায় লোক ভোলাচ্ছে।

বড় বড় গদী আজ দখল করেছে কা'রা? দলীয় ষড়যন্ত্রে যাদের হাত পাকা, যাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ, যারা বড় বড় ঠিকাদারের তাঁবেদার, যারা ধনকুবেরদের বন্ধু, যারা জাতির স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের প্রভুত্বকে বড় ক'রে দেখে এসেছে। যারা আজ গদী আঁকড়ে ধরেছে, তাদের অনেকেই কায়েমী স্বার্থের দালাল, তুষ্কৃতের সমগোত্রীয়, ইংরেজের

অনুগ্রহপুষ্ট,—যাদের অনেকেই বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-হীন! ফলে, কি ঘটছে চোখের সামনে, চেয়ে দেখো। প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে কদর্য অভিযোগ, সরকারী দলের বিরুদ্ধে জঘন্য নোংরামির কাহিনী!

বেদেনি, এই সর্বনাশা ভাগ্যচক্রান্তের একমাত্র উপায় হোলো বিপ্লব। এই বিষবাষ্পের থেকে নিষ্কৃতির সেই একমাত্র পথ।—আমি দেশের শত্রু নই, জাতিদ্রোহী নই,—তোমার মতো আমিও চাই দেশের কল্যাণ, আমারও জীবন-মন-প্রাণ এই পবিত্র মাটির নীচে শিকড় নামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব আজ দিতে পারো? পারো কি আমার সমস্যার মীমাংসা করতে? কেন আমার এই রুদ্ধশ্বাস, কেন বা এই কণ্ঠরোধ? আমিও শান্তি চাই, কিন্তু সেই শান্তি মৃত্যুর মতো নয়, শ্মশানের মতো নয়, অরণ্য অথবা মরুভূমির মতোও নয়। আমি শান্তি চাই লোকযাত্রার মধ্যে, জনতার ভীড়ে, জনপদের মাঝখানে—সমগ্র আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সেই অখণ্ড অনির্বচনীয় শান্তি!

বেদেনি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি স্বভাবের শুচিতার জন্য, তোমার হৃদয়ের উদার বিশালতার জন্য, তোমার চরিত্রের অপরিসীম সাধুতার জন্য। তুমি সত্যবতী, আনন্দময়ী, আশ্বাস-বাদিনী, সন্তাপহারিণী! নিত্য সুধার পাত্র তোমার হাতে, চক্ষে তোমার কালবিজয়িনী মমতা, ললাটে তোমার ভারতের মহিমার চিহ্ন, চিবুকে তোমার মহীয়সীর গরিমা, দুই হাতে

তোমার কল্যাণ আর করুণ স্নেহ। তুমি এই দেশশত্রু আর সমাজদ্রোহীর নমস্কার গ্রহণ করো।

বেদেনি, আমিও আলো চাই। কিন্তু সে আলো কোথা? কা'র হাতে সেই অনির্বাণ প্রদীপ? কে দেখাবে পথ? শুধু কি কাঁদবো যুগ যুগান্তর? শুধু কি কল্যাণের বিনাশ সইবো জন্মজন্মান্তর? আমিও চাই সেই অকম্প প্রদীপশিখা,—সে-আলো প্রলয়ের নয়, ঝঞ্ঝার নয়, বিপ্লবের নয়,—সে আলো আনন্দের। সে-আলো কি তোমার হাতে? সে-আলো কি আমার হাতে? কিন্তু তবু সেই আলো চাই,—যে-আলোয় আমরা দুজনেই দুজনকে চিনে নিতে পারবো! তৃষ্ণার্ত অন্ধকার অজানা আশঙ্কায় থর থর করছে একটু আলোর জন্য।

সে-আলো নেই, বিশ্বাস করো, বেদেনী। সে-আলো অপর কেউ এসে দেখাবে,—তুমি আমি নয়। হয়ত যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে যে-বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে, তা'র থেকে উঠে আসবেন প্রদীপ হাতে নিয়ে আগামী কালের বৈশ্বানর। তাঁরই আলোয় চিনে নিতে পারবো আমাদের নির্ভুল পথ!

চিঠিখানা হাতে নিয়ে পাথরস্তূপের মতো স্তব্ধ হয়ে তপতী ব'সে রইলো। মজনু একবার কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার সে চ'লে গেল। দাই একবার

ঘুরে গেল পাশ দিয়ে। খানসামাও একবার এসেছিল এইদিকে কিছু একটা নির্দেশ নেবার জন্য, কিন্তু বেগতিক দেখে সেও গা ঢাকা দিল।

মাঝে মাঝে মনে হয় জটিল এ জীবন। যেন এর কোনো দিশা নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেন অকূল জলে ভাসা কুটো, নিয়তির হাতের ক্রীড়নক, ভাগ্যদেবতার জুয়া। সমস্যায় এত জটিল, এমন নিরর্থক গ্রন্থির পর গ্রন্থি—যেন এর থেকে মুক্তির আশা দুরাশামাত্র। বুদ্ধি দিয়ে একে বোঝা কঠিন, কেননা বুদ্ধি অনেক সময় মায়াচ্ছন্ন ; চেতনা দিয়ে একে ধরা যায়না, কেননা চেতনাও মোহগ্রস্ত। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীশাবকের নিরুপায় ব্যাকুলতা শুধু ডানা ঝাপটিয়ে মুক্তির পথ খোঁজে !

কেন আসে দুর্বোধ্য কান্না ? কেন চারিদিক থেকে এসে ঘিরে দাঁড়ায় দয়া, মায়া, মোহ, কৃপা, মমতা ? কেন এই শ্মশান বৈরাগ্য ? কেন বা এই অসাড় জড়তা ? সত্যই কি পথ নেই ? আলো নেই ? কোন্ মিথ্যাবাদী তবে প্রচার করেছে দৈববাণীর কথা ? দেবতার আশীর্বাণীর স্তোকবাক্য ? কা'কে বলে সত্য ? মিথ্যা কা'র নাম ? সব প্রশ্নই কি তবে নিরুত্তর থেকে যাবে ? শেষ পথের রেখাও কি মিলিয়ে যাবে কুজ্ঝটিকায় ? তপতীর নিশ্বাস যেন ভয়ে রুদ্ধ হয়ে এলো।

পিছন থেকে কমল ডাকলো, বৌদিদি ? ব'সে বসেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ ?

হাতের মধ্যে মাথাটা ঝুঁকিয়ে টেবলের উপরেই তপতী চোখ বুজেছিল। মাথা তুলতেই দেখা গেল চোখ ছুটো ভার, মুখখানা থমথম করছে। বললে, না ভাই, মাথাটা বড্ড ধরেছে আজ।

গাড়ী নিয়ে ঘুরেছ বুঝি খুব রোদ্দুরে ?

কই, না ?

কমল বললে, মাথা ধরেছে, না ঘুরেছে ?

তপতী হাসিমুখে বললে, কেন বলো ত ?

আমার ধারণা দেশ থেকে চিঠি এলে ভদ্রলোক মাত্রেরই মাথা ঘোরে। তোমার হাতের কাছেও দেখছি চিঠির তাড়া।

তপতী সচেতন হয়ে অভিমন্যুর চিঠির পাতাগুলি একত্র ক'রে গুছিয়ে রাখলো। বললে, না এজন্য নয়।

কমল বললে, তোমার কলকাতার যা খবর তা'তে অনেক সময় মাথা ঘুরেও যায়, বৌদিদি। কলকাতা শান্তিতে থাকতে কখনো শেখেনি। এই ত্যাখো আবার নতুন কাণ্ড।

পকেট থেকে পাটকরা খবরের কাগজখানা বা'র ক'রে কমল একটা বিশেষ জায়গা খুলে তপতীর সামনে ধরলো। কলকাতার কারাগারে রাজবন্দীদের ওপর গুলীচালনা করা হয়েছে।

গুলী!—তপতী যেন শিউরে উঠলো।

কমল বললে, হ্যাঁ, তারা নাকি জেলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ-বাধিয়েছিল।

তপতী ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে, সবাই কি মারা গেছে ?

না, সবাই নয়। কিন্তু যাদের জীবনের আশা কম, তাদের নাম একে একে বলে যাই শোনো,—কয়েকজন আহত রাজবন্দীর নাম কমল প'ড়ে গেল। তার মধ্যে একটি নাম হোলো—অভিমন্যু রায়.।

কি নাম বললে ?

ফটিক সামন্ত, জটাধর পাইন, সুব্রত মিত্র······

না—না,—ওই যে আর একটা নাম বললে কি যেন······?

অভিমন্যু রায় !—কমল বললে।

তপতী চুপ ক'রে রইলো। কমল কাগজখানা মুখের সামনে রেখে ব'লে যেতে লাগলো, এরা উপবাস আরম্ভ করে আট দিন আগের থেকে। প্রতিজ্ঞা করে, না খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে !

তপতী বললে, অভিমন্যু রায়ও ?

হ্যাঁ, সবাই। বিশেষ ক'রে অভিমন্যু রায়,—কেননা সে এদের নাটের গুরু ! আচ্ছা বৌদিদি, মানুষ আটদিন কেমন ক'রে নির্জলা উপবাস করে বলতে পারো ? ভাবতে পারো না খেয়ে মরা ?

তপতীর গলার ভিতরে কি যেন একটা পিণ্ড বাইরের দিকে উঠে আসতে চাইছিল, সে একবার ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি উঠে

চ'লে গেল। স্নানের ঘরে এসে মাথা নীচু ক'রে সে দাঁড়ালো, বোধ হয় একটা বমির বেগ এসেছিল, সেটা আবার ফিরে গেল গলার নীচের দিকে ধীরে ধীরে। তপতী অঞ্জলি ভ'রে জল তুলে নিল মাথায় ও মুখে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে যখন কমলের সামনে আবার বসলো, তখন মুখখানা তা'র শান্ত। অনেকটা যেন সে নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে। বার বার ডেকেও যেন তার সাড়া মিলবে না।

কাগজখানা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে কমল বললে, আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে বৌদিদি। তোমার শীত করছে না?

শীত? কই, না?

কমলের সরলতার উপর কোনো দাগ পড়তে চায় না। সে হাসি মুখে বললে, দুদিন আমি আসিনি। যে যেন কতদিন! পরে ভাবলুম, আচ্ছা দুদিনের জন্যেও বৌদিদিকে রেহাই দেওয়া যাক্। কিন্তু আজ কলকাতার খবরটা তোমাকে না জানিয়েই বা থাকি কেমন ক'রে? পেট্রল পুড়িয়ে এলাম ছুটতে ছুটতে।

গুলীচালনায় কে কে নিহত হয়েছে, এ প্রশ্নটা তপতীর মুখে এসেছিল। কিন্তু সেকথা চাপা দিয়ে সে বললে, গাড়ীতে এলে বুঝি?

বাঃ রোজই ত' আসি গাড়ীতে? কেন, তুমি হর্ণ শোনোনি?

ও, হর্ণ দিয়েছিলে ?

কমল তা'র মুখের দিকে তাকালো। বললে, বৌদিদি, তুমি কি ভাবছো বলো ত ?

তপতী বললে, ভাববার ত' আর কিছু রইলো না, কমল ?

কেন একথা বলছ, বৌদিদি ?

এম্‌নি। আচ্ছা কমল, বাতাসের আগে কে বেশী দৌড়য় বলতে পারো ?

ওঃ এই কথা!—কমল বললে, এই ভাবছিলে এতক্ষণ ? শুনতে পাই রকেট প্লেন নাকি বাতাসের আগে যায়!

তপতী আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলো, মন যায় না ? প্রাণ ? চেতনা ? তবে কি মহাভারতের কথা মিথ্যে ? একটুও সত্যি নেই কোথাও ?

তপতীর গলার আওয়াজটা কিছু ভগ্ন, কিছুটা অস্বাভাবিক। কমল বললে, হ্যাঁ, তা যদি বলো তবে অবিশ্যি অন্য কথা! আমি ভাবছিলুম বিজ্ঞানের দিক থেকে। নিশ্চয়! একশোবার! ধরো, প্রবাসী সন্তানের ভয়ানক অসুখ, মায়ের কাছ থেকে বহু দূরে। সেখানে মায়ের মন ত' সন্তানের শিয়রে নিত্য জাগ্রত! মনের গতি বিদ্যুৎগতির অপেক্ষাও দ্রুত!

শোনো কমল, দেশ ছাড়া আমার প্রিয় কিছু নেই। কিন্তু দেশের চেয়েও প্রিয় কিছু আছে, তুমি জানো ?

অনেকের আছে, অনেকের নেই!

বললে, বৌদিদি, তোমার মাথা ধরেছে, তুমি বিশ্রাম নাও গে দেখি? অন্যদিন এসে তোমার কথার জবাব দেবো।

গাড়ীতে স্পীড্ দিয়ে কমল বাগান পেরিয়ে চ'লে গেল।

নিঃঝুম সন্ধ্যা রইলো সামনে। প্রেতকায় পপলারের সুদীর্ঘ সারি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। শীতার্ত সন্ধ্যায় পাখী ডাকে না কোথাও।

অভিমন্যুর শেষ চিঠিখানা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন প্রশ্ন ক'রে চলেছে,—দুর্বোধ্য দুর্ভেদ্য প্রশ্ন। কিন্তু তবু সে-প্রশ্ন চিরকালের, সে-প্রশ্ন অনাদ্যন্ত, জন্ম-মৃত্যু-জরার অতীত,—সে-প্রশ্ন নিরুত্তর আকাশের মতো। সুখ কি, পথ কি, আনন্দ কি, জীবন-মৃত্যুর ব্যাখ্যা কি, অমৃত কা'র নাম, অস্তিত্বের পরম তাৎপর্য কি,—সমস্তই যেন জিজ্ঞাসার চিহ্ন। একটি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মানুষের জীবনব্যাপী দুঃসাধ্য তপস্যা। অবশেষে পায় সার্থকতা, আবার ছোটে দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে! মর্ত্যসীমাকে সে লঙ্ঘন করে, জীবনকে অতিক্রম করে,—হয়ত মহৎ মৃত্যুর অতীতলোকে সে আলো খুঁজে পায়। অভিমন্যু যাকে বলেছে আনন্দের অকম্প প্রদীপশিখা,—সে কোথায়? সে বস্তু কি দেখতে পায় কেউ? যদি পায় তবে কেন ছোটে মানুষ গরিমাময় মরণের দিকে, কেন তপস্যার শক্তিতে ঘটায় দুঃখ-রাতের অবসান, উন্মাদ বিপ্লবী কোন্ গৌরব মহিমার আস্বাদলাভের জন্য ছুটে যায় সর্বনাশের পথে?

আহত অভিমন্যু এতক্ষণে নিশ্চয় মৃত্যুবরণ করেছে, একথা বিশ্বাস ক'রে নিল তপতী। আত্মাভিমান তাকে টেনে নিয়ে গেল ধ্বংসের দিকে। বিপ্লবের ক্ষুধা তাকে বিদীর্ণ ক'রে দিল, নূতন সৃষ্টিকল্পনার ভয়ানক পিপাসা আপন পরমায়ুর বিন্দুর উপরে তাকে স্থির থাকতে দিল না। আপন অসহনীয় অস্তিত্বের প্রতিবাদ জানিয়ে সে চ'লে গেল। ধৈর্যের প্রশ্ন এখানে ওঠেনা, কেননা ধৈর্যই নাকি অপৌরুষ—অভিমন্যু এই কথা বলতো। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে কর্মযোগ ঘটলেই দৈবমহিমার অবতরণ ঘটে, অভিমন্যু একথা বিশ্বাস করতে চাইতো না! দেবত্বের প্রতি সে আস্থাবান ছিল না, কারণ সে ছিল আত্মাভিমানী। মানুষ কাজ করে মানুষের জন্য, এইটুকু সে বুঝতো। মানুষ হোলো যন্ত্র, তা'র কাজ হোলো দেবতার পূজার নৈবেদ্য সাজানো, এ বিশ্বাস ছিল তা'র কাছে অশ্রদ্ধেয়। অকল্যাণ, অন্যায় ও অপরাধ—এরা যে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসবীজ বহন করে, একথা অভিমন্যু মানতো না; সে জানতো কেবল অন্যায়ের উচ্ছেদ সাধন করা। এই ছিল তা'র বিপ্লববাদ, এই তা'র ধ্বংসের মন্ত্র। নিজের আত্মাভিমান নিজের কাছেই তা'কে অসহনীয় ক'রে তুলেছিল। প্রতিভা, জ্ঞান, কর্মবুদ্ধি—এগুলোর তপস্যা সত্যই ছিল তা'র জীবনে। কিন্তু এদের উৎস ছিল কোথায়, জীবনের মূল থেকে কেমন ক'রে এদের উদ্ভব ঘটতো, কে জোগাতো শক্তি, কে আনে আবেগে বিহ্বলতা,

কে ফুটিয়ে তোলে আনন্দময়. অনুপ্রেরণা, শুভকল্পনা কেমন ক'রে অন্তরের মধ্যে জন্মলাভ করে,—পণ্ডিত অভিমন্যু এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলোনা কোনোদিন। প্রতিভাবান অভিমন্যু, জ্ঞানী অভিমন্যু, কর্মী অভিমন্যু, বিপ্লববাদী এবং ধ্বংসবুদ্ধিপরায়ণ অভিমন্যু, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদমত্ত অভিমন্যু,—এই সর্বসম্মিলিত অভিমন্যুর প্রাণচেতনার চূড়ায় ব'সে যিনি নিত্য বংশীরব তোলেন—সেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর প্রতি অভিমন্যুর দৃষ্টি গেলনা; মৃত্যুমুখী আত্মাভিমান তাকে টেনে নিয়ে গেল আত্মনাশের দিকে।

যে-যৌবনের প্রতীক ছিল অভিমন্যু, সে যে জরা ব্যাধিময় নয়, একথা কে বিশ্বাস করবে? সে-যৌবন নষ্টবুদ্ধি, নীতিভ্রষ্ট,—সাময়িক মোহবিহ্বলতায় সে আত্মঘাতী। অভিমন্যু সেই বিকারগ্রস্ত যৌবনশক্তিকে কষাঘাত ক'রে নিয়ে চলেছিল এক অনিশ্চিত আশঙ্কার দিকে, যেদিকটা অন্ধকার এবং অনিশ্চয়তার জটিলতায় দুর্গম। আলোকের জন্য আকুলিবিকুলি ক'রে মরেছে অভিমন্যু—কিন্তু আলোকের বিপরীত পথ ধরেছিল সে। বড় তপস্যা হোলো বাহ্যিক কর্মের নয়,—কিন্তু আত্মচৈতন্যকে উপলব্ধি করা, অভিমন্যু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বিপ্লবের অন্তরে যদি আত্মিক শক্তি না থাকে, যদি তা'র মধ্যে দেবতার মহিমাকে খুঁজে না পাওয়া যায়,—তবে সেই বিপ্লব বিদ্বেষ

আর হিংসায় ভ'রে ওঠে। সেখানে পিশাচের কোলাহলে, দানবের হিংসা-হলাহলে, ইতরের দ্বন্দ্বাঘাতে রাষ্ট্রের প্রাণ হয়ে ওঠে কণ্ঠাগত, শুচিতা ও পুণ্যের পথ হয় কণ্টকাকীর্ণ। অভিমন্যু এই অশুচি চিত্তের আস্ফালন আর আত্মাবমাননাকর স্বেচ্ছাচারকে মনে করেছিল বিপ্লবের ডমরুধ্বনি। ব্যাধির বিকারকে মনে করেছিল শক্তি, প্রলাপকে মনে করেছিল বিপ্লবের মন্ত্র। অবশেষে মৃত্যুবরণ ক'রে সে উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেল।

মৃত্যু! অভিমন্যুর?

তপতীর পা দুটো থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। সামনে তমসা, পিছনে তামসিকতা,—আলোবায়ুহীন, চেতনালেশহীন। তপতী সেইখানে সর্বস্বান্তের মতো ব'সে পড়বার চেষ্টা করলো। নতজানু হয়ে অস্ফুট জড়িতে কণ্ঠে বলতে চাইলো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু কা'র ইচ্ছা, কোন্ ইচ্ছাময়ের অভিলাষ পূর্ণ হবে? তপতীর সর্বাঙ্গ অবশ, হিমাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কেউ কি তা'কে টেনে নিয়ে যেতে পারে এই অন্ধকারের থেকে? এই সুখের, স্বস্তির, আরামের, আলস্যের নরককুণ্ড থেকে? ইচ্ছাময়ের কি এই ইচ্ছা ছিল, সে থাকবে পরিপূর্ণতার মধ্যে, আর অভিমন্যু মরবে বিষে নীল হয়ে? অভিমন্যুর শবদেহের অসাড় বুকের উপরে কান পেতে কি কেউ শুনেছিল, তপতীর জীবন সার্থক হয়েছে? তপতীর ঘটেছে সর্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি?

সেই শবদেহের কানে কানে কেউ কি তপতীর শেষ করুণ মিনতির কথা জানিয়েছিল ?—যা শুনে জ্বলজ্বালাময় সেই রুদ্রাক্ষ অশ্রুময় কমলাক্ষে পরিণত হয়েছিল ?

সম্মুখের দীর্ঘ ঋজু শান্ত পপলার অন্ধছায়াচ্ছন্ন প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান। সে-ছায়া অভিমন্যুর মতো দীর্ঘ। বাতাসে আন্দোলিত হয়ে কী যেন বীজমন্ত্র শোনালো তপতীর কানে কানে। ভীত তপতী সহসা সর্বশক্তিদ্বারা নিজেকে সচেতন ক'রে সেখানে থেকে দ্রুতপদে স'রে গেল। ভয়ত্রস্তা হরিণী যেন ছুটে এলো আপন অন্ধ গূঢ় গুহায়। অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে দরজায় খিল তুলে দিয়ে সে ঢুকলো বিছানার মধ্যে আত্মগোপন করার জন্য !

চোখ বুজলো সে,—একটা ঘন দুর্ভেদ্য অতল অচল আবিলতার ভিতর দিয়ে কোথায় সে যেন নিশ্চিহ্ন হোলো। অন্তর্মুখী চেতনার একটা আভায় সে যেন দেখতে পেলো অপার আত্মরহস্যলোক। আশ্চর্য সেই পৃথিবী। তা'র আরণ্যলোক অভিমন্যুর নিশ্বাসে মর্মরিত ; পর্বত কন্দর, গহ্বরগুহা, অন্দর প্রান্তর,—সমস্তটাই অভিমন্যুর চেতনায় পরিপূর্ণ। সে-পৃথিবীর অণুপরমাণু অভিমন্যুময়। শিরা উপশিরায় গ্রন্থিতে ধমনীতে লক্ষ লক্ষ অভিমন্যুর বিন্দু প্রবাহিত। সমগ্র আকাশে অভিমন্যুর আভা, বাতাস অভিমন্যুর গন্ধে ভরা। আত্ম-চেতনার সেই পৃথিবীর অমৃত-আস্বাদ অপর একটি পিপাসার্ত তপতী যেন দূরের থেকে লেহন করতে লাগলো।

আরো নীচের দিকে নেমে গেল সে। ঘনতর গূঢ়তর এক আবিলতার দিকে—যেখানে চৈতন্যের সূক্ষ্মতম বিন্দু। বুদ্ধি, বিদ্যা, উপলব্ধি যেখানে আজও পৌঁছয়নি কোনো মানুষের,—মহাযোগীর ধ্যানদৃষ্টিতে যে-অবস্থা ক্বচিৎ কখনো প্রতিভাত হয়। তপতী সেইখানে এসে দাঁড়ালো। কোথা অভিমন্যু? কে নিয়ে গেল তা'কে কোথা দিয়ে? কোথায় সে নিশ্চিহ্ন হোলো? মৃত্যু কি এই পথ দিয়ে যায়? অমৃতকে খুঁজে আনার কি এই একমাত্র পথ? তপতী মীনবৎসার মতো আঁকু-পাঁকু করতে লাগলো সেই আবিলতার মধ্যে।

সত্যবান রূপবান ছিল, প্রেমিক ছিল,—কিন্তু জীবনতপস্বী ছিল কি? ছিল তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম, ছিল কি সে দুঃখজয়ী? প্রতিজ্ঞায় আর প্রতিভায়, পৌরুষে আর প্রবলতায়, হিংসায় আর দৃঢ়তায় কে ছিল অভিমন্যুর চেয়ে বড়? অভিমন্যু ভ্রান্তবুদ্ধি আত্মাভিমানী, কিন্তু আপন সত্যের প্রতি অবিচল একনিষ্ঠতা—তা'র কি কোনো মহিমা নেই? সততায় সাধুতায় শুচিতায় আত্মোৎসর্গে,—সে ত' সত্যবানের অপেক্ষা কম ছিল না! চারিদিকের আবিলতার মধ্যে সেও চেয়েছে আলো, দুর্গম বন্ধুরতার ভিতর দিয়ে সেও খুঁজেছে দিশা, অবরোধের পাথর বিদীর্ণ ক'রে সেও আনতে চেয়েছে বিপ্লবের বন্যা! কিন্তু সংশয়ের সাপ তা'কে বিষাক্ত ফণায় দংশন ক'রে মেরেছে!

অভিমন্যুর অপমৃত্যু ঘটেছে, ঘটেছে সেই ভ্রান্তির শোচ-

নীয় অবসান; কিন্তু হে কৃতান্ত, অভিমন্যুকে সগৌরবে ফিরিয়ে এনে দাও মধুর চৈতন্যলোকে। প্রেম অনেক বড়, দেবত্বের অপার মহিমা কি তা'র চেয়েও বড় নয়? সেই মহিমার স্পর্শে অভিমন্যু নবজীবন লাভ করুক। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে সে জীবনের ধারা বেয়ে ফিরে আসুক। হে দক্ষিণদিক্‌পতি, তুমি তা'র দিক নির্দেশ করো!

তপতীর নিমীলিত দৃষ্টির কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। যত ভগ্নতা অভিমন্যুর, যত খর্বতা আর ক্ষুণ্ণতা, যত মালিন্য আর মোহমত্ততা—সমস্ত ধুয়ে যাক্ এই অশ্রুতে। হে ধর্মরাজ, তুমি তা'কে দেবত্বের পথে ফিরিয়ে আনো। তাকে দীক্ষা দাও, ইষ্টমন্ত্র দাও, দাও তা'কে অভয়বাণী, অশোকমন্ত্র, অমৃতের স্পর্শ। তাকে অসতের থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও।

হে মৃত্যুর দেবতা, তুমি জীবনের বীজমন্ত্র জপ করো অভিমন্যুর অবনত মস্তকে। তুমি ত'ার জরাকে নাশ করো, দুর্গতির থেকে উদ্ধার করো, অপমানের থেকে তুলে ধরো। মারীভয়, জড়তা, পঙ্গুতা, ও অজ্ঞানকে মোচন করো। অশুচি চিত্তের বিকারকে দূর করো। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও অপৌরুষের বিনাশ ঘটাও। তা'র জীবন থেকে পিশাচের কোলাহলকে ঘোচাও, গ্লানি ও ধিক্কারকে অপসারণ করো।

তারপর!

তপতী যেন যোগ-নিদ্রার থেকে সহসা জেগে উঠে বসলো।

তখনও তা'র আবিল দুই দৃষ্টি। কিছু দেখা যায় না,—প্রত্যূষের স্বচ্ছতার আগে যেন রাত্রির গাঢ়তম অন্ধকার। মৃত্যুর মহাচ্ছন্নতার থেকে অভিমন্যুই যেন উঠে এসে আশ্রয় নিল তপতীর শরীরের রোমাঞ্চে ; অভিমন্যুই যেন তা'র অঙ্গে-অঙ্গে, স্তবকে-স্তবকে বাসা বেঁধেছে। দুজনে ছিল দেহে পৃথক, কিন্তু সত্তায় অভিন্ন। এখন দুইয়ে মিলে এক, অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, অদ্বৈত। তপতী উঠে দাঁড়ালো অভিমন্যুকে নিয়ে, শব ও শিব সম্মিলিত, জীবন ও মৃত্যুর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। এবার অভিযান বীর্যের, আনন্দের, দুঃসহ প্রেমের অনির্বাণ পাবকশিখার। ভুল হবেনা আর, পা টলবেনা, পথ হারাবেনা, অজ্ঞানের অবরোধ মানবেনা। চলো অভিমন্যু, তোমাকে নিয়ে যাবো মৃত্যুর থেকে জীবনের দিকে। চলো তপতী, তোমাকে নিয়ে যাবো জীবনের থেকে দেবত্বের দিকে।

নিশাচর পাখীর ডাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো তপতীর। অন্ধকারে ধীরে ধীরে চোখ মেলে সে তাকালো। মনে হোলো প্রেতলোকে আর নরলোকে একাকার। বুকের ভিতর ধকধক করছে। আস্তে আস্তে বিছানার থেকে নেমে এসে তপতী আলো জ্বালবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বিবশা, বিস্রস্তা ও বিব্রত বোধ করলো সে নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্য। রাত্রি নিঃসাড়, সুষুপ্ত বেলাবন, পত্রপল্লবের মর্মর ভিন্ন আর কোথাও চেতনার চিহ্ন নেই। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একবার নিজেকেই সে ঝাঁকুনি দিল।

অতঃপর দ্রুতহস্তে পশমের জামাটা কোনমতে চড়িয়ে শালের শাড়ীখানা কোনোমতে জড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে তপতী বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে ডাকলো, দাই? মজনু?

খানসামা সাড়া দিল, হুজুর—

গাড়ী বাহার করো, নন্দ্‌লাল!

ঘরের দরজা খুলে খানসামা বেরিয়ে এলো। তারপর এঘরের দরজা ঠেলে সে দাইকে ডেকে তুললো। গাড়ী ছিল গ্যারেজে, বারান্দার নীচেই। খানসামা তা'র উর্দি আর কোর্ত্তা চড়িয়ে এসে দ্রুতপদে গাড়ী বা'র ক'রে নিয়ে এলো।

রাত কতো, দাই?

ফজব্‌ কো বাকি নেই, মাই—

তপতী কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়ীতে উঠে পিছনের সীটে বসলো। খানসামা ষ্টার্ট দিল মোটরে।

গোমতীর উপরে তখনও আভা পড়েনি প্রত্যূষের—আবছা অন্ধকারে পথ ও প্রান্তর অস্পষ্ট। মোটর হেড্‌লাইটের আলোয় দ্রুতগতিতে ছুটলো লক্ষ্মৌর দিকে। চোখ বুজেই তপতী বললে, কমল বাবুকো হোটেলমে চলো।

যো হুকুম।

কমলের হোটেলের কাছে একসময়ে পৌঁছে খানসামা কয়েকবার হর্ণ দিল। শীতার্ত্ত লক্ষ্মৌ তখনও অগাধ নিদ্রায়

মগ্ন, কেউ সাড়া দিল না। খানসামাকে দাঁড়াতে ব'লে তপতী নিজেই নেমে এলো, তারপর ফটকের লাইট-গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে সোজা বারান্দা ধ'রে একদিকে চললো।

হঠাৎ একজায়গায় থেমে সে কড়া নাড়তে লাগলো। একটু পরেই ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে কমল উঠে এসে দরজা খুলে দিল। সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বাললো।

এ কি! তুমি?

তপতীর প্রেতিনী, কমল!

অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে, বৌদিদি। এখনও যে ভোর হয়নি!

তপতী সহজ কঠোর কণ্ঠে বললে, কমল, তোমার কাছে কোনোদিন কিছু দাবি করেছি?

কমল বললে, না, কোনোদিন না।

আজ যদি করি?

বলো কি হুকুম? সাধ্যের অতীত হলেও পালন করবো!

তপতী বললে, আমাকে তুমি ভালোবাসো?

কমল চোখ রগ্ড়ে তপতীর দিকে তাকালো। তারপর হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রে বললে, বৌদিদি, এ কি পরীক্ষা তোমার?

বলো, আমার একটি অনুরোধ রাখবে?

নিশ্চয় রাখবো।

তপতী বললে, তবে তৈরী হয়ে এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়, বৌদিদি ?

প্রশ্ন করোনা, ভাই !—এই ব'লে তপতী সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার ফটকের দিকে চলতে লাগলো হন হন ক'রে।

এদিক থেকে গলা বাড়িয়ে কমল বললে, আমি আসছি বৌদিদি, একটু অপেক্ষা করো।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই কমল বেরিয়ে এলো গরম পোষাক প'রে। মোটরের মধ্যে বসেছিল তপতী কেমন যেন আত্ম-সমাহিত হয়ে। পথের আলোগুলির আভা তখন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। কমল তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে উঠে তপতীর পাশে বসলো। তপতী খানসামাকে বললে, ময়দান কি তরফ চলো।

মোটর আবার ছেড়ে দিল। ব্যাপারটা সমস্তটাই জটিল, অদ্ভুত এবং আকস্মিক উত্তেজনা মনে হচ্ছে। উদ্বেগ এবং কৌতূহলকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে কমল প্রশ্ন করলো, তোমার মাথাধরা সেরেছে ? ভালো আছো এখন ?

তপতী শুধু সংক্ষেপে জবাব দিল, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, কমল। শুধু আজকে আমার আচরণকে ক্ষমা করো, ভাই।

* *
*

দমদমার বিমান-ঘাঁটিতে নামলো দুজন—তপতী আর কমল। বেলা তখন দশটা। কাগজপত্রে লেখালেখির বাধ্য-

বাধকতা ছিল। সেগুলো সেরে তা'রা ট্যাক্সিতে উঠলো। ট্যাক্সি ছুটলো কলকাতার কোলাহলের দিকে।

কলকাতার অভিজ্ঞতা কমলের ছিল না। সবটাই তা'র চোখে নতুন। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করা চলবে না, এবং নিজের বহু প্রশ্নকেই কমল সংযত ক'রে চলছিল। তপতী এখন সহজ ও সুস্থ নয়,—এর পর কমল তা'র কাছে সব কথাই জেনে নেবে। তপতী উদ্‌গ্রীব উৎসুক হ'য়ে পথ ফুরোবার অপেক্ষায় ছিল।

অতি পরিচিত পুরনো বন্ধুর মতো একটির পর একটি পথের বাঁক যেন তপতীকে অভিবাদন জানাচ্ছে দুদিক থেকে। কত পায়ের চিহ্ন তা'র আর অভিমন্যুর কত পথে আজ প'ড়ে রয়েছে। ব্যাধের বাণে বিদ্ধ চক্রবাক্ বুকের রক্ত ঝরিয়ে কোথায় হারালো, আর আর্তকণ্ঠী আকুল চক্রবাকা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হোলো। সহসা অশ্রুর ঝলক এসে তপতীর চোখ দুটোকে ঝাপসা ক'রে দিল।

বকুলবাগানের বাড়ীতে পৌঁছে তপতী ছুটে গেল অন্দরের দিকে। মা ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে তা'রও আগে। উভয়ের মাঝখানে আর কোনো ভাষার প্রয়োজন ছিল না। কান্নাতুর তৃষ্ণাতুর তপতী ভগ্ন ব্যথাতুর মাতৃবক্ষে আশ্রয় নিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো অশ্রুমুখী মায়ের আলিঙ্গনের মধ্যে। মা বললেন, কাল ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে, কিন্তু পুলিশের ভয়ানক কড়াকড়ি—কিছু জানতে

পারিনি। রাত্তিরে দুটি ছেলে এসে বললে, অভিমন্যুর কোনো আশা নেই। কাল সন্ধ্যে বেলাতেও একজন ছুটে এসে আরো মন্দ খবর দিয়ে গেছে, মা।

তবে কি সত্যিই সে নেই মা?—তপতীর কণ্ঠ প্রায় সংযম হারালো।

মা ডুকরে কেঁদে বললেন, পোড়ারমুখি, তুই ত নিজের হাতে মাথার সিঁদুর মুছে ছিলি একদিন?

তপতী শান্তভাবে স'রে দাঁড়ালো। চোখ মুছে স্পষ্টকণ্ঠে সে বললে, সেই তুমি দেখলে শুধু, মা? সিঁদুরের রং দেখলে, রক্তের লাল দেখলে না? শোনো মা, আমি আর ফিরবো না। কিন্তু ফিরি যদি, শুধু হাতে নয়, একা নয়—এও ব'লে যাচ্ছি।

মা বললেন, তপতী, তপতী শুনে যা মা—একটু জল দিয়ে যা মুখে—লক্ষ্মী মা আমার—

তপতী ফিরে দাঁড়ালো। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁধের উপর মুখ রেখে বললে, না খেয়ে সে মরেছে, মরেছে গুলী খেয়ে,—আমাকে আর কিচ্ছু তুমি বলো না মা—

এমন সময় কমল এসে দাঁড়ালো। মা বললেন, এ ছেলেটি কে, মা?

ও, ভুলে গেছি। কমল, এই আমার মা!

কমল বললে, আপনি আমার মা, উনি আমার বৌদিদি! —এই ব'লে হেঁট হয়ে সে দুজনকেই প্রণাম করলো।

মা বললেন, সকাল বেলা বাসি মুখে চ'লে যেতে নেই, বাছা।

কমল বললে, কথা দিচ্ছি মা, বৌদিদিকে নিয়ে আবার বাসিমুখেই ফিরে আসবো!

দুজনে এসে আবার মোটরে উঠলো।

কমল স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারেনি, কিছু বুঝবার সাহসও তা'র ছিল না। সে যেন অনেকটা নিরুপায় দ্রষ্টা, তা'র সামনে দিয়ে সমস্তটা ঘটে যাচ্ছে এই মাত্র। ভয়ানক একটা বেদনার ছায়া পড়েছে তপতীর জীবনে, শুষ্ক রক্তাভ তা'র নিরাশ দৃষ্টি দেখে এই কথাই কমলের মনে হয়।

তপতী এক সময় ডাকলো, কমল?

কেন, বৌদিদি?

তবে কি সব মিথ্যে? সবটাই শূন্য?

কমল বললে, জীবনটা ত' মিথ্যে নয় বৌদিদি, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আছি!

তপতী বললে, আঘাত খেয়ে যদি মাটিতে লুটোতে হয়?

তবে মাটিতে ভর দিয়েই আবার উঠে দাঁড়াবে?

তপতী আবার ডুবে গেল নিজের মধ্যে। কতক্ষণ—তা জানবার উপায় নেই,—হয়ত বা যুগ-যুগান্তর। হয়ত এক জন্মের থেকে আর এক জন্মের অন্ধকার আবিলতার রহস্যালোকে সে ভ্রমণ ক'রে উঠে এলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, ও, কিন্তু কাল রাত্রে যে আমি—

কমল উৎসুক জিজ্ঞাসা নিয়ে তা'র দিকে মুখ ফেরালো! তপতী মোহাচ্ছন্নের মতো পুনরায় বললে, ভুল ত' করিনি··· আমি দেখেছি!

কি দেখেছ, বৌদিদি? স্বপ্ন?

না—না, স্বপ্ন নয়······

মোটর এসে বড় ফটক পেরিয়ে সোজা হাসপাতালে ঢুকলো। গাড়ী থেকে নেমে তপতী ছুটলো একদিকে। এখানকার অলি-গলি বিধিনিষেধ অনেক আগের থেকে তা'র জানা আছে। ময়না তদন্ত শেষ হয়েছে কিনা তা'র জানা নেই, তবে অভিমন্যুর লাস যদি তা'কে এখনই হাতে ক'রে নিতে হয়, তবে তার জন্য অবশ্যই সে প্রস্তুত। কমল ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তপতীর পিছনে পিছনে চললো।

বৌদিদি, কোথা যাচ্ছ তুমি বলো ত?

সিঁড়ি বেয়ে তপতী উঠছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এটা হাসপাতাল, কমল!

কমল বললে, তাত' দেখছি, কিন্তু তুমি কেন এখানে?

তপতী আবার কিছুদূর উঠে গেল। বললে, মড়াটাকে খুঁজে বা'র করতে হবে ত!

মড়া! কা'র?

আমার নিজের।—তপতী উপরে উঠে গেল।

উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জনৈক পুলিশ কর্মচারী তা'কে দেখে হাত তুলে নমস্কার জানালেন। লোকটি

অপরিচিত নয়, এঁরই হাতে তপতী বা'র দুই গ্রেপ্তার হয়ে এককালে জেলে গিয়েছিল। ইংরেজ আমলে এদের দাপটে নগর কাঁপতো, আজ হয়ত নগরের দাপটে এরাই কাঁপছে! তপতী প্রতি নমস্কার জানালো।

লোকটি দুপা এগিয়ে এসে বললে, আসুন—

কোথায়?

আপনি ত' ওদের খোঁজ নিতে চান্? অবিশ্যি এখন ইন্টারভ্যুর সময় নয়,—আপনি ত' জানেন—তবে আপনি যখন এসেছেন—

যন্ত্রচালিতের মতো তপতী তাঁকে অনুসরণ করলো। কমল চললো সঙ্গে সঙ্গে। বড় হল্ এবং বারান্দা পেরিয়ে আর একটা মস্ত হলে তা'রা এসে পৌঁছলো। আশপাশে সতর্ক প্রহরা। অফিসার বাইরে দাঁড়িয়েই সবিনয়ে বললেন, ভেতরে যান্? আপনাদের কোন পারমিট লাগবেনা।

ভিতরে ঢোকবার আগেই ষ্ট্রেচারে ক'রে একটি মৃতদেহকে আবৃত ক'রে বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়া হোলো। ভিতরে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন আহত রোগী,—তাদের আর্তনাদ, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা, তাদের নানাবিধ বাদ-প্রতিবাদ,—ওদের পাশ দিয়েই তপতী অগ্রসর হোলো। তা'র গলার ভিতরে ব'সে একটি কিশোরী বালিকা তিনদিন ধ'রে যেন অনুক্ষণ কাঁদছে, তাকে না থামাতে পারলে তপতী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতেই পারবেনা।

তপতী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ; বহু রোগীর ভীড়ে চোখ তুটোকে কোথাও স্থির ক'রে রাখার ক্ষমতা তা'র ছিল না! তা'র সেই বিব্রত ভাবটি লক্ষ্য ক'রে পুলিশ কর্মচারীটি পুনরায় অগ্রসর হয়ে এলেন। বললেন, আসুন এদিকে—

কয়েকটা পাশাপাশি বিছানা পেরিয়ে একটি জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন। তপতীর পা তুটো ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। একটী নার্স এসে দাঁড়ালো তাঁদের পাশে। কাছেই বিছানাটার দিকে নির্দেশ ক'রে নার্স বললে, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনো আশা ছিল না, পরে মাঝ রাত্তির থেকে অবস্থা একটু ফিরেছে। সকাল থেকে ভালোই আছেন।

রোগীর শিয়রের কাছে একখানা সরকারি কাগজ প'ড়ে ছিল। অফিসার মহাশয় সেখানা তুলে তপতীকে দেখালেন। তা'তে লেখা রয়েছে, "আহত রাজবন্দী অভিমন্যু রায়কে অতঃপর কারাগারে পুনরায় নিয়ে যাওয়া সরকারের অভিপ্রায় নয়। তাঁর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার মনে করেন, তাঁকে বিনাসর্তে আপাতত মুক্তি দিলেই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

ফস ক'রে কমল বললে, বৌদিদি, এঁকে যেন কোথায় দেখেছি আমি। অবিকল এই চেহারা। মনে ক'রে দেখো ত?

তপতী বললে, বেলাবনে দেখেছ এঁকে আমার বাংলায়।

ঠিক, ঠিক তাই। ইনিই ত রায়মশাই!

অভিমন্যু চোখ মেলে তাকালো। সর্বাঙ্গ তা'র ঢাকা, কপালে ফেট্টি বাঁধা, মুখের উপরে ক্ষতস্থানে দুইটি তালি লাগানো। অফিসার মহাশয় উপস্থিত না থাকলে তপতীর পক্ষে চিনে বা'র করা কঠিন হোতো। রোগী বড় বড় চোখ চেয়ে আবার চোখ বুজলো!

তপতী ঝুঁকে পড়লো অভিমন্যুর মুখের উপর। কিছু বলবার ছিল না, কিছু জানবারও ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে তপতী বললে, কমল, যাঁকে তুমি এতদিন ধ'রে আমার গল্পের মধ্যে খুঁজেছিলে, এই তিনি! এবার সংশয় ঘুচেছে?

কমল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

তপতী বললে, এই তোমার দাদা, অভিমন্যু রায়। এঁর খবর তুমিই আমাকে শুনিয়েছিলে খবরের কাগজ থেকে।

কমল কি যেন বলবার চেষ্টা করতেই তপতী চোখের জল মুছে বললে, যাক্ কমল, সব কথা বলতেও নেই, শুনতেও নেই। চলো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। উনি ঘুমোন্, পরে আবার আসবো।

পুলিশ অফিসারকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে তপতী কমলকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। বেলা তখন প্রায় দুটো বাজে। পাঁচটার সময় আবার তাকে আসতে হবে।

পথে নেমে এসে কমল বললে, বৌদিদি?

কেন, কমল?

তাহলে সবটাই মিথ্যে, সবটাই শূন্য নয়, মানো ত ?

চোখের জল চেপে তপতী মধুর হাসির সঙ্গে বললে, এবার গাড়ী ডাকো দেখি ?

সম্মুখে রাজপথের উপর বিশাল মারমুখী জনতা নানাবিধ ধ্বনিতে তখন আস্ফালন করছিল। তা'রা জড়ো হয়েছে অভিমন্যু রায়ের শবদেহ বা'র ক'রে নেবার জন্য। সেই শবদেহ নিয়ে তা'রা শবযাত্রা করবে শ্মশানের পথে। আজ সকালের সংবাদপত্রে এই প্রকারের আভাস ছিল।

দিন তিনেক পরে হাসিমুখে কমল বিদায় নিচ্ছিল। বাইরে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, সামান্য জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠছে—এমন সময় একজন চাপরাশি এসে হাজির হোলো। প্রাদেশিক সরকারের দপ্তর মারফৎ একখানা জরুরী চিঠি এসেছে তপতীর নামে। চিঠির সঙ্গে মোটা টাকার একখানা চেক্ আঁটা রয়েছে।

উল্‌টে পাল্‌টে চিঠিখানা নিজে প'ড়ে তপতী কমলের হাতে দিল। চিঠির মর্ম এই :

"গভর্ণমেণ্টের কাজে আপনি এতদিন ধ'রে যে পরিমাণ আন্তরিক সহায়তা ক'রে এসেছেন, তা'র জন্য গভর্ণমেণ্ট আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। একজন মহিলার পক্ষে এইরূপ অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে কর্ম্মপরিচালনা করা নারীসমাজের পক্ষে গৌরব ও আনন্দের কথা! কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল

থেকে কোনো কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত আপনার সংসর্গ লক্ষ্য ক'রে গভর্ণমেণ্ট আপনার সম্পর্কে নানাপ্রকার সংশয় পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে সকল দিক বিবেচনা ক'রে তাঁ'রা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাষ্ট্রের কল্যাণ বিবেচনায় আপনার সহিত গভর্ণমেণ্টের সর্বপ্রকার যোগ ছিন্ন করার প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের নিকট আপনি এতাবৎ কোনো অর্থাদি গ্রহণ করেননি, কিন্তু আপনার প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ কম নয়। যথাযথ হিসাবাদি ক'রে গভর্ণমেণ্ট এতৎসহ আপনার প্রাপ্য বেতনের টাকা পরিশোধ ক'রে দিচ্ছেন।"

বিবর্ণমুখে কমল তাকালো তপতীর প্রতি। তপতী বললে, এতদিন পরে আমার সত্যকার মুক্তি হোলো, কমল। এই আজ আমার সব চেয়ে আনন্দ।

এ কি কথা, বৌদিদি ?—কমল একটু উত্তেজিত হোলো।

শান্তকণ্ঠে তপতী বললে, তোমার দাদার চেয়ে আমার চাকরি ত' বড় নয়, ভাই ?

একে তুমি আঘাত ব'লে মনে করো না ?

একেবারেই না। আমার সখ ছিল, শান্তি ছিল না, কমল। আরাম ছিল, আনন্দ ছিল না।—শোনো, এই টাকা আমি নিতে পারবো না, ভাই। এ তুমি নিয়ে যাও!

আমি ? তোমার টাকা ? কী বলছ, বৌদিদি ?

তপতী হাসিমুখে বললে, ভয় নেই, ঠাকুরপো। মেয়ে-

মানুষের প্রাণের টান না থাকলে সহজে দানখয়রাৎ করে না। কিন্তু এবার তোমাকে একটি কাজের ভার দেবো।—মজ্নুকে চেনো ত? খানসামার সেই ছোট্ট ছেলেটা? ওকে মানুষ করবে তুমি। সব চেয়ে নীচের থেকে সব চেয়ে উঁচুতে ওকে তুলে ধরবে। এ ছাড়া আমার কাপড় চোপড় ইত্যাদি যা কিছু পাবে, দাইকে দিয়ো সব। আর, এই টাকার থেকে পাঁচ হাজার টাকা তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়ো। তুমি যাকে বিয়ে করবে, আমি তাকে কিছু উপহার কিনে দেবো।—না না, আমার কথার প্রতিবাদ করতে নেই, কমল!

কমলের কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। বললে, তবে সেই মেয়ে তুমি আমার হাতে তুলে দাও, যে-মেয়ে তোমার উপহারের যোগ্য?

কিয়ৎক্ষণ কী যেন ভেবে তপতী বললে, আচ্ছা দেবো, কথা দিলুম।—এই ব'লে চেকখানার পিছনে তপতী কমলের নাম লিখে নিজের নাম সই ক'রে দিল। কমল তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলো।

মোটর চ'লে গেল বকুলবাগানের পথ পেরিয়ে। কমলের চ'লে যাওয়ার সঙ্গে তপতীর জীবনের একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ যেন শেষ হয়ে গেল। এবার আবার নতুন পৃষ্ঠা ওলটানো!

* *

*

এর থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, অভিমন্যু। এই ক্ষয়ক্ষীণতা, এই ভগ্নতা, এই স্বভাব-রুগ্নতা। এ তোমার আসল পরিচয় নয়! উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করো বিশাল এক সংহতির সংবাদ—এ কালের সেই হোলো শ্রেষ্ঠ বাণী! সকল জাতি সকল বিশ্বাস সকল ধর্মসম্মেলনকে ডাকো, জগতের সকল বন্ধু ও বিরূপকে, সেই তোমার একমাত্র আনন্দের পথ।

তপতী বলতে লাগলো, হাজার বছরের দুঃখ বেদনা ও আত্মোৎসর্গের পরিণতির দিকে তাকাও অভিমন্যু,—গ্রহণ করো এই দুর্লভ স্বাধীনতাকে। এবার চলো তুমি সর্বাঙ্গীন মহৎ মুক্তির পথে। নৈরাশ্য, সংশয় আর অজ্ঞানের অন্ধকারকে মোচন করো নিজের হাতে। উদ্‌ভ্রান্ত এই মানব সভ্যতাকে পথনির্দেশ করার দায়িত্বভার তুলে নাও,—জ্যোতির্ময় দেবত্বের দিকে সেই মানবতা শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক। জীবনের যোগাসনে দেবতার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা, এই হোক তোমার সাধনা!

অভিমন্যু তাকালো তপতীর আনন্দময় মুখখানির দিকে। সেই মুখের উপর ছায়া পড়েছিল দিনান্তের রক্তিম মহিমার। তপতী বললে, অভিমন্যু, চোখ মেলে তাকাও নৈতিক অধোগতির দিকে। এ সঙ্কট শুধু তোমার আমার নয়, বাংলার অথবা ভারতের নয়, প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের নয়,—এ হোলো বিশ্ব-জীবনের অন্তর্নিহিত সঙ্কট। সৃষ্টিলোকেরও আছে যুগপরিবর্তন, সেই হোলো তা'র কল্পান্তর। আজ এই নবকালের কল্প-

সন্ধিস্থলে তুমি এসে দাঁড়াও অভিমন্যু, চেয়ে দেখো তোমার দক্ষিণে সৃষ্টি, বামে প্রলয়। এখানে দাঁড়িয়ে তুলতে পারো তুমি মানুষকে অতিমানবতার উচ্চ মহিমায়, অথবা নামাতে পারো অনেক নীচে, পিশাচের কোলাহলের তলায়, পঙ্ককুণ্ডে, অন্ধ বিশৃঙ্খলতার নরকে।

অভিমন্যু, ক্ষমা করো বিজ্ঞানকে, কেননা সে ভ্রান্তবুদ্ধি। ক্ষমা করো ক্ষমতাকে, কেননা সে বর্বর; ক্ষমা করো দুর্নীতিকে, কেননা সে অজ্ঞান! মশাল জ্বালিয়ো না, জ্বালিয়ো না অগ্নিকুণ্ড, —জ্ঞানের প্রদীপ তুলে ধরো, সবাই খুঁজে পাবে পথ। বিরাট চৈতন্যকে জাগ্রত করো, সেই আত্মিক শক্তির বলে বিরাটতর জীবনের পুনর্গঠন হবে, সেই সম্মিলিত চেতনায় খুঁজে পাবে অগ্রগতি, খুঁজে পাবে আনন্দময় শান্তি!

অভিমন্যু হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলো কয়েকদিন পর। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লাভ ক'রে তপতী ইতিমধ্যে তা'কে ভর্তি করেছিল এক ক্যাবিনে,—সেইখানে অহোরাত্র থেকে নিজের হাতে অভিমন্যুর ক্ষতের উপর সে প্রলেপ দিয়েছে, সেবা করেছে অবিশ্রান্ত, আনন্দের মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে প্রতিদিনের প্রহরগুলি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুর্বল শরীরে অভিমন্যু একবার প্রস্তাব করেছিল, বাঙলার বাইরে কোথাও যাবার জন্য। কোনো দূর দেশের পাহাড়ের উপত্যকায়, কোনো বনের

ধারে, কোনো নামহারা নদীর তীরে। সেখানে শান্ত কুটীর, ফুলের চারায় ছাওয়া অঙ্গন, বনের পাখীর কণ্ঠের কাকলী, দূরেব মাঠের রাখালের বাঁশীর গান,—ভালো লাগছিল তা'র একটা নিরিবিলি জীবন কিছুকালের জন্য।

তপতী প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, যেতে দেবো না কোথাও। এই বাংলায় থাকবো দুজনে। এই কলহ-সংশয়-বিদ্বেষের মাঝখানে, এই আমাদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখানে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মাঝখানে দেশের মানুষ অনাহারে শুকিয়ে মরে, কাজের চাকা কাদার তলায় ব'সে যায়, ভদ্রজীবনে আসে ধিক্কার, স্বভাব-দৈন্যে বুদ্ধি আর মনুষ্যত্ব পঙ্গু,—এদেরকে ফেলে কোথাও পালাতে চেয়ো না, অভি। এখানে ব'সে ভাবের নদীকে বাঁধো, সে যেন কূলছাপানো বন্যায় সর্বনাশ না করে; বুদ্ধিকে বাঁধো, সে যেন কুচক্রে যোগ না দেয়; বিদ্যাকে বাঁধো, সে যেন জটিল পাণ্ডিত্যে নিজেকে নিষ্ক্রিয় না করে; ন্যায়বিচারশক্তিকে বাঁধো, সে যেন অতিশয় সমালোচনায় সমস্যাকে ঘুলিয়ে না তোলে। অভিমন্যু, বাঙলা ছেড়ে কোথাও যেতে চেয়ো না। কিন্তু এবার শান্ত হও তুমি। প্রতীক্ষা করো, রাত্রির শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছি,—আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়োনা, নতুন সৃষ্টির জন্ম ঘটে শাশ্বত বেদনার থেকে। চেয়ে দেখো প্রসন্ন চক্ষে, সেই শুভলগ্ন সমাগত। এই বাঙলায় আবার জন্ম হবে নরভারতের, আবার উচ্চারিত হবে নতুন দীক্ষামন্ত্র, বাঙালী আবার বসবে

জপের আসনে। সেই আসনের থেকে দেখাবে ঐক্যসাধনার পথ। মেলাতে চাইবে, মিলতে চাইবে, মিলিত হবার জন্য শ্রীক্ষেত্র রচনা করবে।

অভিমন্যু ধীরে ধীরে তপতীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। আনন্দ-উচ্ছ্বসিত চক্ষে তপতী পুনরায় বললে, নবভারতের সেই সূচনার জন্য তুমি প্রস্তুত হও, অভিমন্যু!